ইউনিট ৭

উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

ভূমিকা

খুলাফায়ে রাশিদীনের পতনের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৬৬১ খ্রিস্টব্দে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন তা 'উমাইয়া খিলাফত' নামে পরিচিত। এই বংশটি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই বংশে মোট ১৪ জন খলীফা ছিলেন। এই বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)। সিরিয়ার দামেস্কে ছিল তার রাজধানী। উমাইয়া বংশ কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন আবদে মানাফ। আবদে মানাফের ৬ পুত্রের মধ্যে হাশিম, মুত্তালিব ও আবদে শামস ছিলেন সহোদর ভাই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন হাশিমের বংশধর। আর আবদে শামসের এক পুত্রের নাম ছিল উমাইয়া। উমাইয়ার সন্তানরাই উমাইয়া বা বনী উমাইয়া বলে পরিচিতি লাভ করে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এই ইউনিটে উমাইয়া আমলের খলিফাদের ক্ষমতায় আরোহণ, তাঁদের চরিত্র, কৃতিত্ব ও আনীত সংস্কারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা
পাঠ-৭.২ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৭.৩ : ইয়াযিদ : কারবালার ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ-৭.৪ : আব্দুল মালিকের রাজ্যবিস্তার ও সংস্কার সমূহ
পাঠ-৭.৫ : আল-ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তার ও কৃতিত্ব
পাঠ-৭.৬ : উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসননীতি, সংস্কার ও কৃতিত্ব
পাঠ-৭.৭ : হিশামের শাসন ব্যবস্থা
পাঠ-৭.৮ : উমাইয়া আমলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
পাঠ-৭.৯ : উমাইয়া খিলাফতের পতন

পাঠ-৭.১ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুয়াবিয়া (রা.) এর পরিচয় ও বংশ সম্পর্কে জানবেন ।
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রথমিক জীবন সম্পর্কে জানবেন।
- উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ওহী লেখক, হিমারীয় ও মুদারীয়, খারিজী, ইফ্রিকিয়া ও আল-মাগরিব**

পরিচয় ও ইসলাম গ্রহণ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পবিত্র কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের একজন আবু সুফিয়ান। তাঁর মাতা ছিলেন আবু জেহেলের কন্যা হিন্দা। ইসলামের প্রাথমিস যুগে হযরত মুয়াবিয়া ও তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু। কিন্তু ৮ম হজরীতে (৬৩০ খ্রি:) রাসূল (সা.) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর পিতা-মাতা ইসলাম কবুল করেন। এই সময়ে তার বয়স ছিল ২৪ বছর। ইসলাম কবুলের পর তিনি নিজেকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেন। রাসূল (সা.) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবায় পরিণত হন।

ওয়াহী লেখক : ইসলাম কবুলের পর রাসূল (সা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে তাঁর ব্যক্তিগত ওয়াহী লেখক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি এই কাজে রাসূল (সা.) এর প্রশংসা লাভ করেছিলেন। রাসূল (সা.) তার ভগ্নি উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করেন। এই সূত্রে তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হন। বাল্যকাল হতেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন জ্ঞানী, সুবিবেচক ও ধৈর্যের অধিকারী। মহানবী (সা.) একদা তাকে লক্ষ করে বলেছিলেন যে, "তুমি রাজ্য লাভ করলে জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করো"।

সিরিয়ার শাসনকর্তা : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর রাজনৈতিক জীবনের শুভ সূচনা ঘটে ২য় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে রোমান সাম্রাজ্যের অংশ সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সিরিয়া অভিযানে তার যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন দূরদর্শী ছিলেন না। কিন্তু শাসনক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। খলীফা উমর (রা.) তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরুপ তাকে ৬৩৮ খ্রি: সিরিয়ার শাসনকর্তারুপে নিযুক্ত করেন। তাঁর শাসনকেন্দ্রের রাজধানী ছিল দামেস্ক। ধীরে ধীরে সমগ্র সিরিয়া তাঁর অধীনে চলে আসে। খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে তাকে সমগ্র সিরিয়ার গভর্ণররুপে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি সিরিয়ার রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন।

নৌবাহিনী গঠন : খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর শাসনামলে সিরিয়ার গভর্ণর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর নেতৃত্বে প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয়। এই নৌবাহিনীর সাহায্যে ভূ-মধ্যসাগরীয় কতিপয় দ্বীপ-সাইপ্রাস, ক্রীট, মেজর্কা, মাইনর্কা ইত্যাদি মুসলিমদের অধীনস্ত হয়েছিল। তাই মুসলিম নৌশক্তি গঠনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর কৃতিত্ব ছিল সর্বাগ্রে।

হযরত আলী (রা.) এর সাথে দ্বন্দ্ব :সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ধীরে ধীরে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি সিরিয়াবাসীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাদের সমর্থন লাভে সফল হন। তাই চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) তাঁকে পদচ্যুত করতে গিয়ে সমস্যা ও বাঁধার সম্মুখীন হন। এই সময়ে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং এই হত্যার বিচারকে কেন্দ্র করে হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলাফল স্বরুপ খলীফা আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু কূটনৈতিক

জ্ঞানসম্পন্ন মুয়াবিয়া দুমার সালিশের মাধ্যমে সমগ্র সিরিয়া ও মিসরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। খলীফা হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ্যপুত্র ইমাম হাসান (রা.) এর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রা.) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এই প্রসংগে P.K. Hitti বলেন, æ Muawiyah was proclaimed Caliph at Iliya (Jerusalem) in A.H. 40 (660).”

রাজধানী স্থায়ীকরণ : মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং অভিজ্ঞ প্রশাসক। খিলাফতে আসীন হয়েই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী কুফা হতে দামেস্কে স্থানান্তরিত করেন। উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী হিসেবে দামেস্ক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

খারিজী বিদ্রোহ দমন : রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সাম্রজ্যের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত উসমান (রা.) এর সময়কাল থেকেই সাম্রাজ্যে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। হযরত আলী (রা.) এর সমগ্র শাসনামলে তা অব্যাহত থাকে। এই সময় উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে খারিজী বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারিজীগণ হযরত আলী (রা.) এর নিকট পরাজিত হলেও, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা আবার সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করে। খারিজীগণ কালদীয়া দখল করে ইরাকে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করলে মুয়াবিয়া (রা.) কঠোর হস্তে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব : প্রাচীন আরবের অধিবাসিগণ প্রধান দুটি বংশে বিভক্ত ছিল- যথাক্রমে মুদার বংশ এবং হিমার বংশ। হিমারীয়রা ছিল দক্ষিণ আরবের ইয়েমেনের অধিবাসী। অপরদিকে মুদারীয়রা ছিল উত্তর আরবের হেজাযের অধিবাসী। কাহতানগণ তাদের নৃপতি আব্দুস শামসের পুত্র হিমারের নামানুসারে নিজেদের ‘হিমারীয়’ হিসেবে পরিচিত করে। তারা ইয়েমেনী হিসেবেও পরিচিত লাভ করে। উত্তর আরবের অধিবাসীগণ ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশধর। সাদের পৌত্র মুদার হতে তাদের ‘মুদারীয়’ নামে চিহ্নিত করা হয়। দক্ষিণ আরবের হিমারীয়রা ছিল সুসভ্য এবং মুদারীয়রা ছিল যাযাবর এবং তাদের জীবনযাত্রার মান ছিল নিম্নমানের। এর ফলে রাসূল (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্ব হতেই তাদের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্ব সংঘাত বিরাজমান ছিল। পরবর্তীতে ইসলামের আর্বিভাবের ফলে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। উমাইয়া খলীফা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যকার এই দ্বন্দ্বকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

যোগ্য প্রশাসকদের নিয়োগ : মুয়াবিয়া (রা.) এর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ছিল কতিপয় যোগ্য ব্যক্তিদের সমর্থন ও সহযোগিতা। যথা-

আমর ইবন আল-আস : ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক আমর ইবনে আল আস ছিলেন মুয়াবিয়া (রা.) এর অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ও প্রত্যক্ষ সহযোগী। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে মুয়াবিয়া তাকে মিসরের শাসনকর্তারুপে নিয়োগ করেন।

আল মুগিরা : আল মুগিরাকে মুয়াবিয়া (রা.) কুফার শাসনকর্তা রুপে নিয়োজিত করেন। আল মুগিরার পরামর্শেই মুয়াবিয়া (রা.) তদ্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

যিয়াদ : যিয়াদ সম্পর্কে ছিল মুয়াবিয়ার সৎ ভাই। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি ব্যাপক বীরত্বের পরিচয় দেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাকে বস্রার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। এই প্রসংগে ঐতিহাসিক P.K Hitti বলেন, æThese three with their chief Muawiyah, constituted the four political geniuses (*duhat*) of the Arab Moslems.

সামরিক অভিযান সমূহ : অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর মুয়াবিয়া (রা.) সাম্রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত করেন। তাঁর সময়ে অভিজ্ঞ সেনাপতিদের বিজয় অভিযানের ঘটনা ঘটে।

পূর্বাঞ্চল বিজয় : পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি ছিলেন মুয়াবিয়া (রা.) এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যিয়াদ। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র উবায়দুল্লা পূর্বাঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হন। এই সময় সীমান্তবর্তী উপজাতিরা বিদ্রোহ সৃষ্টি করলে তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন।

গজনী, কাবুল, কান্দাহার, বুখারা দখল : ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিরাতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এর কিছুদিন পর গজনী, কাবুল, কান্দাহার উমাইয়াদের পদানত হয়। ৬৭৪ খ্রি: বুখারা ও ৬৭৬ খ্রি: সমরখন্দ ও তিরমিজ অধিকারে আসে। সেনাপতি মুহাল্লাব ৬৬৫ খ্রি: সিন্ধু নদ পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। তবে এটি ব্যর্থ হয়।

পশ্চিমাঞ্চল বিজয় :

উত্তর আফ্রিকা অভিযান : মরক্কো ও আলজেরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে 'আল-মাগরিব (পশ্চিম)' নামে ডাকা হত। হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে সর্বপ্রথম উত্তর আফ্রিকায় অভিযান প্রেরিত হয়। রোমান সম্রাটের আধিপত্য তখন এই অঞ্চলে সর্বত্র বিরাজমান ছিল। হযরত উসমান ও আলী (রা.) এর খিলাফতের বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করে রোমান সম্রাট পুনরায় বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয় এবং এই অঞ্চলের বার্বার অধিবাসীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার শুরু করে। মিসরের শাসনকর্তা আমর ইবন আল আসের মাধ্যমে অবহিত হয়ে মুয়াবিয়া (রা.) ১০,০০০ সৈন্যসহ ওকবা বিন নাফিকে ৬৭০ খ্রি: উত্তর আফ্রিকার অভিযানে প্রেরণ করেন। ওকবা রোমান বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম হন। এই অঞ্চল উমাইয়া খিলাফতের অধীনস্থ হয়।

কায়রোয়ান প্রতিষ্ঠা : ৬৭০ খ্রি: ওকবা কায়রোয়ান নামে একটি প্রসিদ্ধ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এটি উত্তর আফ্রিকার রাজধানীতে পরিণত হয়। তিনি এখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ওকবা আরো পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং একের পর এক শহরে বন্দর জয় করেন। তাঁর বিজয়াভিযান সুদূর আটলান্টিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুয়াবিয়া (রা.) ওকবাকে তার বিজিত অঞ্চলগুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি এই অঞ্চলে মুসলিম শাসন সুসংহত করে যেতে পারেননি। ওকবার বীরত্ব ও কৃতিত্বের কথা স্মরণ করেই ঐতিহাসিকগণ তাকে আরব আলেকজেন্ডার (Alexander of the Arabs) উপাধিতে ভূষিত করেন।

কনস্টান্টিনোপলে নৌ-অভিযান : মুয়াবিয়া (রা.) মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠনে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের দাবিদার। সিরিয়ার গভর্ণর থাকা অবস্থায় তিনি নৌ-বাহিনী গঠন করেন এবং ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলি, রোডস, ক্রীট ইত্যাদি দখল করেন। আরব নৌ–অধ্যক্ষ (admiral) আব্দুল্লাহ বিন-কায়েস এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। মুয়াবিয়া (রা.) সিরিয়ার উপকূল রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আর্মেনিয়া দখল : ৬৬২ খ্রি: আর্মেনিয়ার রোমানদেরকে পরাজিত করে আর্মেনিয়া দখল করেন এবং আকব নামক স্থানে একটি পোতাশ্রয় স্থাপন করেন। ৬৬৯ খ্রি: এই পোতাশ্রয় হতে মুয়াবিয়া বাইজানটাইন শক্তির রাজধানী কনস্টানিটনোপলে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ কিন্তু বেশ কিছুদিন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ রাখার পর মহামারী, খাদ্যাভাব, বিশৃঙ্খলা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে অভিযানটি ব্যর্থ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, রোমানদের বিরুদ্ধে ভূ-মধ্যসাগরে টিকে থাকার জন্য মুয়াবিয়া ৫০০ রণতরী নিয়ে এক বিশাল নৌ-বহর গঠন করেন। এর ফলেই ভূ-মধ্যসাগরে মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাসন ব্যবস্থা : মুয়াবিয়া একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। তিনি তার শাসন প্রণালীতে বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের রীতি প্রবর্তন করেন।

ডাক বিভাগ : মুসলিম প্রশাসকদের মধ্যে মুয়াবিয়া সর্বপ্রথম ডাক বিভাগ চালু করেন। সরকারী ও বেসরকারী তথ্য ও সংবাদ ইত্যাদি আদান প্রদানের জন্য তিনি তার সমগ্র রাজ্যে ১২ মাইল অন্তর একটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগকে বলা হত 'দিওয়ান আল-বারিদ' (ডাক বিভাগ) এবং এর প্রধান পরিচালককে বলা হত সাহিব-আল-বারিদ। এই বিভাগ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতো।

দিওয়ান আল খাতাম : দিওয়ান আল-খাতাম ছিল সাম্রাজ্যের রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন বিভাগ। খলীফা কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যেকটি বিধান এই বিভাগে রেজিস্ট্রি করা হতো এবং পরবর্তীতে তা সিল প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হতো।

রাজস্ব সংস্কার : মুয়াবিয়া অর্থনৈতিক বিভাগকে একটি স্বকীয়রূপ দান করেন। মুয়াবিয়া (রা.) রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সাহিব আল-খারায নামক একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি স্বয়ং খলীফা কর্তৃক এই বিভাগে নিয়োগ প্রাপ্ত

হতেন। খলীফা উমর (রা.) এর নীতি অনুসারে যে বার্ষিক নির্ধারিত পরিমান ভাতা মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হতো তা তিনি দরিদ্র কর (যাকাত) হিসেবে কেটে রাখতেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রশাসনিক সচিবালয় : শাসনকার্যে সুবিধার জন্য মুয়াবিয়া (রা.) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সচিবালয় স্থাপন করেন। কেন্দ্রে আরবী ভাষার প্রাধান্য ছিল এবং প্রদেশেগুলোতে নিজস্ব ও স্থানীয় ভাষার প্রচলন ছিল। এর ফলে যাবতীয় সরকারী দলিলপত্র, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়।

নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠা : মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন মুসলিম নৌ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সময় হতেই মুসলমানগণ নৌ অভিযানে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এছাড়া হযরত উমর (রা.) এর সময়ে প্রবর্তিত প্রশাসনের অন্যান্য শাখা যেমন- দিওয়ান আল-জুনদ (সামরিক বিভাগ), দিওয়ান আল-কাজা (বিচার বিভাগ), দিওয়ান আল-রাসায়িল ইত্যাদি বিভাগ তিনি পুন:প্রবর্তন ও বহাল রাখেন।

ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন : কুফার শাসনকর্তা ও মুয়াবিয়া (রা.) এর অন্যতম উপদেষ্টা আল-মুগীরার পরামর্শে মুয়াবিয়া তার পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। তার এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী উমাইয়া খলীফা ও আব্বাসীয় খলীফাগণ অনুসরণ করেন। এইভাবে মুয়াবিয়া (রা.) ইসলামের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটান এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ইতি টানেন।

সারসংক্ষেপ:

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা.) ইসলামের ইতিহাসে একজন দক্ষ ও দূরদর্শী নৃপতি হিসেবে পরিচিত। তিনিই প্রথম ইসলামে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটান এবং মনোনয়ন ভিত্তিক উত্তরাধিকারী নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করেন। তিনি অপর পক্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা মুসলিমদের পদানত হয়। তিনি প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসন বিভাগ দিওয়ান আল বারিদ, দিওয়ান আল খাতাম ইত্যাদি বিভাগ চালু করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম নৌ-বাহিনীর রূপকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয় ?
ক) কুফা খ) দামেস্ক গ) বসরা ঘ) ইয়েমেন

২. মুয়াবিয়া (রা.) কে 'প্রথম রাজা' বলা হয় । কারণ -
ক) তিনি এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন খ) তাকে জনগণ এই উপাধি দিয়েছিল
গ) রাজপ্রসাদে বসবাস করতেন বলে ঘ) ইসলামে প্রথম রাজতান্ত্রিক শাসন চালু করেন

৩. মুয়াবিয়া (রা.) এর শাসন সংস্কারগুলো হলো-
i) ডাকঘর প্রতিষ্ঠা ii) সচিবালয় স্থাপন iii) নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i, ii খ) i, iii গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেব হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কথা উল্লেখ করলেন। তিনি চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর পর নতুন খিলাফত চালু করেন। তিনি রাজ্য বিস্তারে খুব মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রশাসনকি সংস্কার সাধন করেন এবং রাজতান্ত্রিক শাসনের সূচনা করেন।

ক) মুয়াবিয়া (রা.) কত খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত চালু করেন? ১
খ) মুয়াবিয়া (রা.) কে প্রথম রাজা বলা হয় কেন ? ২
গ) উদ্দীপকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখুন। ৩
ঘ) "তিনি রাজ্য বিস্তারে খুব মনোযোগী ছিলেন " কথাটি ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৭.২ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুয়াবিয়ার (রা.)-এর চারিত্রিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মুয়াবিয়ার (রা.)-এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- শাসক ও মানুষ হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.) কে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, সভাকবি ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা**

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রায় ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত আলী (রা.) এর সাথে খিলাফতের দ্বন্দ্ব, রাজতন্ত্রের সূচনা, দামেস্কে রাজধানী স্থাপন ইত্যাদি সমালোচানা মূলক কর্মকাণ্ডের পরও তিনি সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যা প্রশংসার দাবিদার। তিনি সামান্য অবস্থা হতে নিজ যোগ্যতা ও কর্মগুণে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি তার খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যকে বর্ধিত করেন এবং বহি:শত্রুর হাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনিই রাষ্ট্রকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামোর উপর দাঁড় করান। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও একজন শ্রেষ্ঠ আরব নৃপতি। P.K Hitti বলেন, æHe was not only the first but also one of the best of Arab kings."

মানুষ হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.)

মুয়াবিয়া (রা.) গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও স্থুলকায় ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। তিনি জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। দেহরক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। মজলিস আল শূরার প্রয়োজন অনুভব করতেন না বরং সকল সমস্যা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সমাধা করতেন। তিনি জুমুআর জামাআতে ইমামতি করতেন। তিনি মার্জিত রুচি ও সংযত চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। তিনি জনগণের উপর দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। এজন্য তিনি ব্যাপক বুদ্ধিমত্তা ও কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দেন।

উচ্চাভিলাষী

মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন উচ্চাভিলাষী একজন ব্যক্তি। খিলাফত লাভ ও ক্ষমতা গ্রহণের প্রতি তাঁর উচ্চাভিলাষ কাজ করেছিল। এই উচ্চাভিলাষের ফলাফল স্বরুপ খলীফা হযরত আলী (রা.) সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব বাধে এবং হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনি উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

দক্ষ ও কৌশলী

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন দক্ষ ও কৌশলী রাজনীতিবিদ। তিনি শঠতা ও ধূর্ততা এবং নম্র ব্যবহারের দ্বারা শত্রুর সন্দেহ দূর করে স্বপক্ষে আনতে পারতেন। কৌশল ও ধৈর্যের সাহায্যে তিনি পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্বে আনতে পারতেন। শান্তিপূর্ণ উপায় যদি ব্যর্থ হত তাহলে তিনি উক্ত ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করতেন।

অমুসলিমদের প্রতি মনোভাব

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে গুণের কদর করতেন। অমুসলিমদের প্রতি তার মনোভাবে ছিল উদার প্রকৃতির। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে তিনি অমুসলিমদের নিয়োগ করতেন। একজন খ্রিস্টান ছিলেন তার প্রধান উপদেষ্টা। তিনি ইবনে আসল নামক একজন খ্রিস্টান চিকিৎসককে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানান। আল-আখতাল নামে তার একজন খ্রিস্টান সভাকবি ছিল।

শাসক হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.):

সুশাসক : মুয়াবিয়া (রা.) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবদি, বিচক্ষণ কূটনীতিবদি এবং সুশাসক হিসেবে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সময়ে

প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কঠোরতা ও দুর্বলের প্রতি সহনীয় আচরণ করতেন। একজন সুশাসকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

কূটনীতিবিদ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ। তিনি ক্ষমতারোহণ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

রাজতন্ত্রের জনক

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইসলামের মৌলিক আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। তিনি প্রথম বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর উমাইয়া খিলাফতের শাসনকাল ছিল ৯০ বছর।

সমরনেতা

ইসলামে সম্প্রসারণে মুয়াবিয়া (রা.) এর ভূমিসা অগ্রগণ্য। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা থাকা অবস্থায় বিশাল সেনাবাহিনী ও নৌ-বহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকা ও ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপসমূহে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
তিনি মজলিস আল শূরার অস্তিত্ব বাতিল করেন এবং মনোনয়নভিত্তিক উত্তরাধিকারী ব্যবস্থার প্রচলন ঘটান। এই কারণে তাঁকে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of a dynasty) বলে অভিহিত করা হয়।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন প্রতিভাবান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও সুশাসক। তাঁর রাজত্বকালে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে, অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মুয়াবিয়া (রা.) কত খ্রিস্টাব্দের জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ৬৮০ খ্রি: খ) ৫৭০ খ্রি: গ) ৬৬৪ খ্রি: ঘ) ৫৮০ খ্রি:

২. মুয়াবিয়া (রা.) এর ক্ষেত্রে কোনটি সত্য ?

ক) রুঢ় স্বভাবের লোক খ) প্রতিভাবান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন
গ) সাহসী ও ধার্মিক শাসক ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক ছিলেন

৩. মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন -

i) সুশাসক ii) সমরনেতা iii) সুদক্ষ রাজনীতিবিদ

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii খ) i, iii গ) i, ii, iii ঘ) iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জহির মিয়া বলা চলে জোরপূর্বক ফুলপুর গ্রামে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষকে আকৃষ্ট করার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তার। তিনি গ্রামের উন্নতি সাধন করেন। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশীয় শাসন কায়েম রাখার জন্য মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্র জমিরকে গ্রামের ক্ষমতার ভার দিয়ে যান।

ক) ইসলামে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন ? ১

খ) মুয়াবিয়া (রা.) কে রাজতন্ত্রের জনক বলা হয় কেন ? ২

গ) উদ্দীপকে যে খলীফার ঈঙ্গিত রয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৩

ঘ) মুয়াবিয়া রা. এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৭.৩ ইয়াযিদ : কারবালার ঘটনা ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইয়াযীদের ব্যক্তিগত জীবন ও ক্ষমতায় আরোহন সম্পর্কে জানবেন।
- ইয়াযিদ ও ইমাম হুসাইনের মধ্যকার বিরোধ সম্পর্কে জানবেন।
- কারবালার ঘটনা, এর কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	নিষ্ঠুরতা ও ইন্দ্রীয়পরায়ণ, কালবাইট খ্রিস্টান, সন্ধিচুক্তি, দুরাভিসন্ধি, তামীম গোত্র, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ও শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব

ইয়াযিদ এর প্রাথমিক জীবন :

মুয়াবিয়া (রা.)-এর পুত্র ইয়াযিদ ২৫ বা ২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে। তার মায়ের নাম ছিল মায়সুন, সে একজন কালবাইট খ্রিস্টান ছিলেন। বাল্যকালে মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াযীদের শিক্ষার জন্য তাকে গ্রামাঞ্চলে (আল-বাদীয়া) পাঠিয়ে দেন। কারণ গ্রামীণ আরবী ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত। বাইজানটাইন শক্তির বিরুদ্ধে কনস্টান্টিনোপলের অভিযানে ইয়াযিদ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। কিন্তু নানা কারণে এই অভিযানটি ব্যর্থ হয়।

ইয়াযিদের চরিত্র

ব্যক্তিগত জীবন ইয়াযিদ ছিল অত্যাধিক শারীরিক শক্তিসম্পন্ন । সে বিলাস-ব্যাসনে নিমগ্ন থাকত। তার চরিত্রে দাম্ভিকতা বিদ্যমান ছিল। নিষ্ঠুর ও ইন্দ্রীয়পরায়ণ এই উমাইয়া যুবরাজ শিকারে চরমভাবে আসক্ত ছিলো। ঐতিহাসিক বার্নাড লুইসের মতে, ইয়াযিদ লম্পট ও দুশ্চরিত্রবান হলেও সে কিছু রাজোচিত গুণাবলির অধিকারী ছিলো। সে শিল্প, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করত। ঐতিহাসিক আল-ফাখারী, ভন ক্রেমার ও ইরনুত তিকতার মতে- ইয়াযিদের রাজত্বকাল তিনটি দুষ্কর্মের জন্য কুখ্যাত– ● প্রথম বছর তিনি হুসাইন-বিন-আলীকে হত্যা করেন; ● দ্বিতীয় বছরে মদীনা লুণ্ঠন করেন এবং ● তৃতীয় বছরে কাবা শরীফের উপর হামলা করেন।

কারবালার যুদ্ধের কারণ

১. সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর জেষ্ঠ্য পুত্র ইমাম হাসান (রা.) এর সাথে এই মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে, মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যুর পর ইমাম হুসাইন (রা.) খিলাফত গ্রহণ করবেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং ৬৮০ খ্রি: ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া দামেস্কের সিংহাসন আরোহণ করে খিলাফত গ্রহণ করেন।

২. ইয়াযিদের ব্যক্তিগত চরিত্র : ইয়াযিদ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন মদ্যপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দাম্ভিক এবং শাসক হিসেবে অযোগ্য। অপর দিকে ইমাম হুসাইন (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.) এর দৌহিত্র ও শৌর্য-বীর্য ও চারিত্রিক গুণে অনন্য একজন পুরুষ। তাই তাঁর প্রতি মুসলিমদের সমর্থন ছিল ব্যাপক।

৩. রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : ইয়াযীদের মনোনয়ন রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে আরো মজবুত করে যা মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক প্রথম স্থাপিত হয়েছিল। এতে করে খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালী যুগের শাসন ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে মক্কা, মদীনা ও কুফার অধিবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে সমর্থন জানায় এবং উমাইয়া শাসনের বিরোধিতা করতে শুরু করে।

৪. মদীনার প্রাধান্য হ্রাস : দামেস্কে খিলাফতের রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে মদীনা তার পূর্বের গৌরব ও গুরুত্ব হারায়। এতে মহানবী (সা.) এর সাহাবা ও তার অনুসারীগণ উমাইয়া খিলাফতের বিরোধিতা শুরু করেন।

৫. ইমাম হুসাইনের ব্যক্তিত্ব ও সরলতা : ইমাম হুসাইন (রা.) ছিলেন ঈমানের শক্তিতে নিষ্ঠাবান। তিনি মদ্যপ, চরিত্রহীন ও দাম্ভিক ইয়াযীদের প্রতি বায়াৎ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। অপরদিকে সরলতার কারণে তিনি ইয়াযিদ ও উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কূট-কৌশলের নিকট পরাস্থ হন।

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর কর্মকান্ড : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)ও ইয়াযিদের বিরোধিতা করেন। তিনিও বায়াৎ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ইমাম হুসাইনকে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করেন। ইমাম হুসাইন (রা.)

ছিলেন ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ ও খিলাফতের যোগ্য দাবিদার। মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক বলপূর্বক ক্ষমতা দখল এবং ইয়াযিদের মনোনয়ন এবং ক্ষমতায় আরোহণ ইত্যাদিতে ইমাম হুসাইন (রা.) তীব্র প্রতিবাদ করতে শক্তি যোগান। বস্তুত মুয়াবিয়া (রা.) এর পুত্র ইয়াযীদের চেয়ে হযরত হুসাইন (রা.) চরিত্র বলে শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই হুসাইন ইবনে আলী (রা.) খিলাফতের ন্যায়-সঙ্গত দাবিদার ছিলেন। তাঁর এই দাবীকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ির (রা.) সমর্থন করেন।

কারবালার ঘটনার প্রেক্ষাপট

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর দুরাভিসন্ধি : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.) মক্কায় চলে আসেন। তাঁরা ইয়াযিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ির (রা.) নানা ভাবে ইমাম হুসাইন (রা.)কে ইয়াযিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন। মূলত তিনি উভয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে খিলাফতে অধিষ্ঠিত করার উচ্চাভিলাষ পোষণ করতেন বলে মনে করা হয়।। মক্কা ও মদীনার অধিবাসী আলীর সমর্থকগণও ইমাম হুসাইন (রা.) কে তাদের সমর্থন দান করে। তাই একপর্যায়ে ইয়াযিদ ও ইমাম হুসাইন (রা.) এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ লাভ করে।

কুফাবাসীর আমন্ত্রণ : কুফার পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকিলকে কুফায় প্রেরণ করেন। মুসলিম কুফাবাসীর সমর্থন দেখে ইমাম হুসাইন (রা.) কে মদীনা ত্যাগ করার পত্র দেন। তার পত্র পেয়ে ইমাম হুসাইন (রা.) সপরিবারে ও অতি অল্প কয়েকজন অনুসারীসহ কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কর্তৃক মুসলিম নিহত হন এবং কুফাবাসী ইমাম হুসাইন (রা.) এর পক্ষ ত্যাগ করে ইয়াযিদ কে সমর্থন জানায়।

আলহোর ও ওমর কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তি : ইমাম হুসাইন(রা.) পথিমধ্যে মুসলিম এর মৃত্যুর সংবাদ পান। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তামীম গোত্রের আল-হোর নামক এক গোত্র প্রধানের কুফার অশ্বারোহী বাহিনী ইমাম হুসাইন (রা.) এর পথ রোধ করে। (১০ সেপ্টেম্বর, ৬৮০) কুফাকে ডানে রেখে ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর ক্ষুদ্র কাফেলাটিকে নিয়ে কুফা হতে ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালার নামক প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন। উমর ইবনে সাদ, উবায়দুল্লার সেনাপতি ৪০০০ সৈন্য নিয়ে তাঁর পথে বাধা দেন।

হুসাইন (রা.) এর **সন্ধি প্রস্তাব :** ওমর হুসাইন (রা.)-কে অবিলম্বে ইয়াযিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে আদেশ দিলে ইমাম হুসাইন (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিণামে ইমাম হুসাইন (রা.)-কে সপরিবারে কারবালায় অবরুদ্ধ করে রাখা হল। তাদের পানি সংগ্রহের পথে কড়া পাহাড়া বসানো হল। হুসাইন (রা.) এর শিবিরে পানির জন্য হাহাকার দেখা গেল। এই অবস্থায় হুসাইন (রা.) উবায়দুল্লার কাছে ৩টি শান্তি প্রস্তাব পেশ করার আর্জি জানালেন। সেগুলো হল :

- তাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক; ● *অথবা*, তুর্কী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক;
- অথবা, ইয়াযিদের সাথে আলোচনার জন্য দামেস্কে প্রেরণ করা হোক;

কিন্তু তার এই অনুরোধ কোনভাবেই গ্রহণ করা হয়নি।

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা : উবায়দুল্লাহর সৈন্যের হাতে বন্দি হয়ে ইমাম হুসাইন (রা.) তার বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীদের পালিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু তারা কেউই তাকে ছেড়ে যেতে রাজি হলো না। অবশেষে ৬৮০ খ্রি: ১০ অক্টোবর মাসে অসহায় তৃষ্ণার্ত নারী শিশুর ক্রন্দনকে তুচ্ছ করে দুটি অসম-দলের মাঝে যুদ্ধ শুরু হলো। ইমাম হুসাইন (রা.) তার ক্ষুদ্র কাফিলা নিয়ে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ ছিলো তাদের চেয়েও সংখ্যায় বহুগুণ বেশি। একে একে সকলেই শাহাদাত বরণ করতে লাগলেন ইমাম হাসান (রা.) এর পুত্র কাসিম, হুসাইন (রা.) এর পুত্র যয়নুল আবিদীন, শিশুপুত্র আসগরসহ পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যকে হত্যা করা হলো। অবশেষে শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে এক পর্যায়ে ইমাম হুসাইন (রা.) ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তার তাবুর নিকট বসে পড়লেন। জনৈক মহিলা তার হস্তে এক পেয়ালা পানি তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পানি পান করার সময় তিনি শিরবিদ্ধ হলেন এবং শেষবারের মতো শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। একসময় অধিক রক্তপাতে জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যুর কোলে শায়িত হলেন। ঘাতক শীমার ইমাম হুসাইনের মস্তক ছিন্ন করলো ও তার দেহ পদদলিত করে বর্বরতা প্রদর্শন করলো। এভাবে ইসলামের ইতিহাসের করুণতম অধ্যায় রচিত হল কারবালার প্রান্তরে। একমাত্র হুসাইনের রুগ্নপুত্র জয়নুল আবেদীন ছাড়া সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন।

কারবালা যুদ্ধের ফলাফল

শিয়া সম্প্রদায়ের জন্ম লাভ : কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড হযরত আলী (রা.) ও ইমাম হুসাইনের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারা হযরত আলী ও ফাতেমার বংশধরকে একমাত্র খিলাফতের দাবিদার হিসেবে ঘোষণা করে। তারা ইসলামের মূল ধারা হতে পৃথক মতবাদ সৃষ্টি করে। এভাবে তারা শিয়া সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব : শিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ফলে পরবর্তীতে শিয়া ও সুন্নী মতবাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। শিয়ারা সুন্নী মতবাদের বিরুদ্ধে নিজস্ব মত আরোপিত করে।

ইসলামী ঐক্যে ভাঙ্গন : কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইসলামের ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। গৃহযুদ্ধের পথকে আরো প্রশস্ত করে দেয়।

হাশিমী- উমাইয়া বিরোধ : এই ঘটনা হাশেমী ও উমাইয়া দ্বন্দ্বে ঘৃতাহুতি দান করে। তা পূর্বাপেক্ষা আরো তীব্ররূপ ধারণ করে।

মক্কা-মদীনা ও বসরায় প্রতিক্রিয়া : কারবালার ঘটনা মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে মক্কা ও মদীনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মক্কা ও মদীনাবাসী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিশোধ দাবি করে। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ির (রা.) খিলাফত দাবি করে বসেন।

মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ির (রা.) কে বন্দী করার জন্য ও মদীনাবাসীকে প্রতিরোধ করার জন্য ইয়াযিদ মুসলিম-বিন উকবার নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মদীনার নিকট হাররা নামক স্থানে ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনার বহু সাহাবী এতে শাহাদাৎ বরণ করেন। দামেস্কের বাহিনী মদীনায় ৩ দিন যাবৎ লুন্ঠন করে অতঃপর মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কর্তৃক বাঁধার সম্মুখীন হয়। ফলে সিরীয় বাহিনী মক্কা অবরোধ করে। অবরোধকালে তারা পবিত্র কাবাঘরে অগ্নি সংযোগ করে। ইতোমধ্যে ৬৮৩ খ্রিঃ ২৭ নভেম্বর ইয়াযীদের মৃত্যু হলে সিরীয় বাহিনী দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করে।

সারসংক্ষেপঃ

ইমাম হুসাইন ও ইয়াযীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং এর ফলাফলস্বরুপ কারবালার বিষাদময় ঘটনার অবতারণা ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য অশণিসংকেত। এটি ইয়াযিদের রাজত্বকালকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অপরদিকে মুসলিম বিশ্ব হারিয়েছে ইমাম হুসাইনের (রা.) মতো একজন বীরপুরুষ নেতাকে। এই ঘটনার সুদূপ্রসারী ফলাফলস্বরুপ উমাইয়া বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। শিয়া মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ এবং সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কারবালার যুদ্ধে কে শাহাদাত বরণ করেন?

ক) ইয়াযীদ খ) হুসাইন (রা.) গ) হাসান (রা.) ঘ) যয়নুল আবেদীন

২. ইমাম হুসাইন (রা.) কেন ইয়াজিদরে কাছে শান্তি প্রস্তাব করেন ?

ক) ইয়াযীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য খ) আর্থিক প্রাপ্তির আশায়

গ) খিলাফত লাভের জন্য ঘ) মক্কায় প্রত্যাবর্তনের জন্য

৩. ইয়াযিদ ছিলেন -

i) মদ্যপ ii) সুশাসক রii) দাম্ভিক

নিচের কোনটি সঠিক -

ক) i, ii খ) i, iii গ) i, ii, iii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

প্রতিবছর ১০ই মহররম বিভিন্ন মুসলিম দেশে শোকমিছিল বের হয়। বাংলাদেশের পুরান ঢাকায় হুসনি দালান হতে সবচেয়ে বড় মিছিলটি বের হয়। তারা বিভিন্ন শোকগাঁথা গায় এবং নিজেদের রক্তাক্ত করে। তারা "হায় হোসেন হায় হোসেন" বলে মাতম করে।

ক) কারবালার যুদ্ধ কত সালে হয়? ১

খ) ইয়াজিদ সম্পর্কে লিখুন? ২

গ) উদ্দীপকের মিছিল যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয় সে ঘটনার কারণ গুলো লিখুন। ৩

ঘ) কারবালার যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৭.৪ আব্দুল মালিকের রাজ্যবিস্তার ও সংস্কারসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আব্দুল মালিকের পরিচয় জানতে পারবেন।
- আব্দুল মালিকের সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তাঁর শাসননীতি ও সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মারওয়ানী শাখা, আরাফাতের যুদ্ধ, 'ময়ূর বাহিনী', রাণী কাহিনা, নোকতা সংযোজন, ফালস (তাম্রমুদ্রা), মাওয়ালী, মুহাফিজখানা ও রাজেন্দ্র**

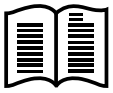

আব্দুল মালিক ছিলেন উমাইয়া খিলাফতের মারওয়ানী শাখার প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান ইবনে হাকামের পুত্র। তিনি ছিলেন খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর ও **১ম** মুয়াবিয়ার চাচাতো ভাই। আব্দুল মালিক ২৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

ক্ষমতায় আরোহণ

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র ২য় মুয়াবিয়া দামেস্কের খিলাফত গ্রহণ করেন কিন্তু ৩ মাস শাসনের পরই মৃত্যুবরণ করেন। তখন খিলাফতের দায়িত্ব বর্তায় তার ভাই খালিদ এর উপর। কিন্তু খালিদ বয়সে নাবালক ছিলেন। তাই তার স্থলে অভিজ্ঞ ও বয়োজৈষ্ঠ্য মারওয়ান ইবনে হাকাম খিলাফত গ্রহণ করেন। তিনি এই শর্তে সিংহাসন অধিকার করেন যে, খালিদ প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় পৌঁছলে খালিদের পক্ষে সিংহাসন ছেড়ে দিতে হবে। সুচতুর মারওয়ান সিংহাসনে বসেই খালিদের বিধবা মাতাকে বিবাহ করেন এবং তিনি তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করে তাঁর নিজ পুত্র আব্দুল মালিককে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। এতে খালিদের মাতা ক্রোধান্বিত হয়ে মারওয়ানকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন।

অতঃপর ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মালিক দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর খিলাফতকালকে (৬৮৫-৭০৫) মোটামুটি ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা-

- বিদ্রোহ দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা
- হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সামরিক অভিযান ও;
- শাসন ব্যবস্থার সংস্কার ও সুদৃঢ়করণ।

মুখতারের বিদ্রোহ দমন

মুখতার ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী যিনি ইমাম হুসাইনের হত্যার প্রতিশোধকল্পে অনুশোচনাকারীদের দলে (Penitents) যোগ দেন। মুখতার ইরাক, পারস্য ও আরব ভূখণ্ডে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী শীমারসহ ২৮৪ জনকে হত্যা করেন। এই অবস্থায় আব্দুল মালিক উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে মুখতারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। টাইগ্রীস নদীর তীরে জাবের যুদ্ধে উবায়দুল্লাহ নিহত হন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের প্রেরিত সেনাপতি মুহাল্লাব কর্তৃক মুখতার নিহত হন।

আমরের বিদ্রোহ দমন

আমর ইবনে সাঈদ ছিলেন মারওয়ানের চাচাতো ভাই যিনি ২য় মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর দামেস্কের খিলাফত এর দাবিদার ছিলেন। মারওয়ানের মৃত্যুর পর খালিদ বিন-ইয়াযিদ কিংবা আমর ইবনে সাইদের পরিবর্তে যখন মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আমর বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কয়েকটি যুদ্ধে আব্দুল মালিক আমরকে পরাজিত করেন কিন্তু ভবিষ্যতে সিংহাসন নিষ্কন্টক রাখার জন্য তিনি আমরকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান ও হত্যা করেন।

মুসাবের বিদ্রোহ দমন

মুসাব ছিলেন ইরাকের শাসনকর্তা যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের অধীনস্থ ছিলেন। মুসহাব মুখতারকে হত্যা করেন। আব্দুল মালিক মুসাবের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে স্বীয় দুই পুত্রসহ মুসহাব নিহত হন। এর ফলে ইরাকে আব্দুল মালিকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে হত্যা

আব্দুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হেজাযের খলীফা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। আরাফাতের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে আব্দুল মালিকের একচ্ছত্র আধিপত্য সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের পুরোপুরি পরিসমাপ্তি ঘটে।

খারিজী বিদ্রোহ দমন

ইতিমধ্যে কট্টরপন্থী খারিজীগণ শাবীব-ইব্নে-ইয়াযিদের নেতৃত্বে প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা কুফা, মসুল ও ইরাকের অন্যান্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খারিজীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে সিরিয়া বাহিনীর সাহায্যে তাদের দমন করা সম্ভব হয়।

জানবিলের বিপর্যয়

জানবিল ছিলেন খুজিস্তানের রাজা যিনি কাবুল হতে কান্দাহার পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। এটি ছিল উমাইয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার প্রতি হুমকিস্বরুপ। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জানবিলের বিরুদ্ধে 'ময়ূর বাহিনী' নামক একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আল-আসাথ ছিলেন এই বাহিনীর নেতৃত্বে। অভিযানটি সফল হয় এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়।

আসাথের বিদ্রোহ দমন

জানবিলের সাফল্য উদ্বুদ্ধ হয়ে আসাথ উমাইয়া খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইরাক ও ইরানে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তা দমনের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বয়ং অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেন। আব্দুর রহমান-বিন-মুহাম্মদ বিন-আল- আসাথ ৭০৯ খ্রিস্টাব্দে সিজিস্তানে আশ্রয় নেন। তার ময়ূর বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়।

বার্বারদের দমন

উত্তর আফ্রিকা বিজেতা উকবা বিন নাফি ৬৮৩ খ্রি: বার্বার নেতা কুসায়ল কর্তৃক নিহত হলে এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং তা স্বাধীন হয়ে যায়। আব্দুল মালিক ৬৯৩ খ্রি: হৃতরাজ্য পুন:দখলের জন্য জুহাইরের নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। জুহাইর গ্রীক ও বার্বার বাহিনীকে পরাজিত ও কুসায়লকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র একটা সেনাবাহিনী রেখে, অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। বার্বার ও রোমানদের অতর্কিত আক্রমণে সেনাপতি জুহাইর পরাজিত ও নিহত হন। আব্দুল মালিক তাই ক্রুব্ধ হয়ে ৬৯৮ খ্রি: হাসান বিন নোমানের অধীনে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। নোমান কার্থেজ ও বার্কা দখল করেন। এভাবে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত উমাইয়া আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হয়।

কাহিনা বিপর্যয়

কাহিনা নাম্নী এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন নারীর সংস্পর্শে বার্বারগণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এক পর্যায়ে বার্বারগণ সেনাপতি নোমানকে পরাজিত করেন। খলীফা আব্দুল মালিক হাসান বিন নোমানের সাহায্যার্থে আরেকটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে বার্বার আফ্রিকান রাণী কাহিনা পরাজিত ও নিহত হয়। প্রায় ১২,০০০ বার্বার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

আব্দুল মালিকের প্রশাসনিক সংস্কার

আব্দুল মালিকের যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রশাসনিক সংস্কারের একটি সোনালীযুগ। তিনি উমাইয়া শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। তার উল্লেখযোগ্য সংস্কারসমূহ হচ্ছে ঃ

সরকারীভাবে অফিসে আরবী ভাষার প্রচলন

ইসলাম তার প্রাথমিক যুগে কেবলমাত্র আরব ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ অপেক্ষা উমাইয়া শাসনামলে ইসলাম তার নিজ ভূখণ্ডে ছাড়িযে আরো বিস্তৃতি লাভ করে। পারস্য, আর্মেনীয়া, খুরাসান, সিরিয়া ও মিসরে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়। এতে করে আরবী ভাষার সাথে আঞ্চলিক ভাষা যেমন- পারসিক, সিরীয়, কপটিক ইত্যাদি ভাষা সরকারি ক্ষেত্রে গোলযোগ ও সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই আব্দুল মালিক এই ভাষা সমস্যার সমাধান ও আরব সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে কেবল আরবী ভাষা প্রচলন করেন। সরকারী দলিল চিঠিপত্র ইত্যাদিতে আরবী ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন।

আরবী বর্ণলিপির উন্নতি সাধন

আরবীকে রাষ্ট্রভাষার ঘোষণার পাশাপাশি তিনি এর উৎকর্ষ বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। ইতোপূর্বে আরবী বর্ণমালায় কোন স্বরচিহ্ন অর্থাৎ নুক্তা ছিল না। তাই অনারব মুসলিমগণ কর্তৃক তা পঠনে অসুবিধার সম্মুখীন হতো। ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আব্দুল মালিক আরবি বর্ণমালায় বা লিপিতে নুক্তা সংযোজন করেন। এতে কুরআন সহজে পাঠ করা সম্ভব হয়।

আরবী মুদ্রার প্রচলন

আব্দুল মালিকের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল আরবী মুদ্রার প্রচলন। এ লক্ষে তিনি রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। রোমান, পারস্য, হিমারীয় ও বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার পরিবর্তে তিনি আরবী অক্ষর যুক্ত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), ও ফাল্স্(তাম্রমুদ্রা) প্রচলন করেন। এতে করে অর্থ জাল করার প্রবণতা দূরীভূত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একক মাধ্যমের সৃষ্টি হয়।

ডাক বিভাগের সংস্কার

আব্দুল মালিক কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকারের যোগাযোগ, পত্রাদি ও নির্দেশমালা আদান প্রদানের জন্য ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই সকল ঘোড়ার গাড়ি প্রয়োজনে সৈন্যদের যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়। ডাক বিভাগের কর্মচারীগণ সম্রাটের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। প্রদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর তারা ডাকের মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন।

রাজস্ব সংস্কার

খলীফা আব্দুল মালিকের সময়ে মাওয়ালী বা নও-মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিম হয়ে তারা খারায বা জিযিয়া কর হতে অব্যাহতি পেতেন এবং যাকাত ব্যতিত আর কোন কর রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হত না। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে তারা রাষ্ট্রকর্তৃক ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করতেন। এতে করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয়। খলীফা আব্দুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মাওয়ালীদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। তাদের উপর পূর্বেকার মতন খারায ও জিযিয়া কর আরোপ করেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও অনুর্বর জমিকে উর্বর করে ফসল ফলানো জন্য তিনি কৃষকদের ৩ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করেন। এতে করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

স্থাপত্য শিল্প

খলীফা আব্দুল মালিক স্থাপত্য শিল্পেও বিশেষ কৃতিত্ব রেখে গেছেন। মহানবী (সা.) যে পাথর খণ্ডের উপর দাড়িয়ে পবিত্র মিরাজে গমন করেন তাকে কেন্দ্র করে এর উপর তিনি আট কোনাবিশিষ্ট "কুব্বাতুস সাখরা" নির্মাণ করেন। এটি Dome of the Rock নামে পরিচিত। যার নির্মাণ ৬৯১ খ্রি: সম্পন্ন হয়। এরই পাশে তিনি 'মসজিদ-উল- আকসা' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি দজলা নদীর তীরে অবস্থিত ওয়াসিত নামক একটি শহর নির্মাণ করেন। দামেস্কে মুহাফিজখানা বা সরকারী দলিল দস্তাবেযখানা (দিওয়ান-আল-রাসায়িল) নির্মাণ করেন।

মৃত্যু ও আল-ওয়ালিদের মনোনয়ণ

২০ বছর গৌরবপূর্ণ রাজত্বের পর ৭০৫ খ্রি: ৬২ বছর বয়সে আব্দুল মালিক মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর জৈষ্ঠ্যপুত্র আল-ওয়ালিদকে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান।

চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন

খলীফা আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে নৃশংসতা ও বর্বরতার অভিযোগ থাকলেও তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও নিষ্ঠাবান শাসক। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। তিনি উমাইয়া বংশের স্বার্থে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। গৃহযুদ্ধ দমন করে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্রকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর কৃতিত্বের জন্য ইতিহাসে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। তিনি ছিলেন রাজেন্দ্র (Father of the kings) কারণ পরবর্তীতে তাঁর চারপুত্র উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাই তাঁকে Father of the kings বলা যথার্থ।

সারসংক্ষেপঃ

আব্দুল মালিক ছিলেন উমাইয়া বংশের একজন শ্রেষ্ঠতম শাসক। ব্যাপক সামরিক দক্ষতা, কূটনীতি, রাষ্ট্রজ্ঞান ও প্রশাসনিক যোগ্যতা তাকে উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দিয়েছে। তার স্থাপত্য রুচিবোধ ছিল প্রশংসার দাবিদার ও উল্লেখযোগ্য। তিনি উমাইয়া সাম্রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও গৃহযুদ্ধ হতে নিরাপদ করে রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঘটান। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আব্দুল মালিক উমাইয়া খিলাফতের কোন শাখায় অন্তর্ভুক্ত ?

ক) হানাফীয়া খ) মারওয়ানী গ) হাশিমী ঘ) কুরাইশ

২. আব্দুল মালিক 'Dome of the Rock' নির্মাণ করেন কেন ?

ক) মেরাজ গমনের ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য খ) জেরুজালেমকে পবিত্র স্থানে পরিণত করার জন্য
গ) মক্কা শরীফের মর্যাদা কমানোর জন্য ঘ) মদিনা মসজিদের মর্যাদা কমানোর জন্য

৩. আব্দুল মালিক -

i) আরবি মুদ্রা চালু করেন ii) কুরআন সংকলন করেন
iii) আরবি বর্ণলিপির উন্নতি করেন

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii খ) ii, iii গ) iii ঘ) i, iii

৪. 'ক' এর আরবীয়করণ নীতি ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। 'ক' নিচের কোনটিকে নির্দেশ করেন ?

ক) মুয়াবিয়া খ) আব্দুল মালিক গ) আল-ওয়ালিদ ঘ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রুবি তার ইতিহাস বই পড়ে জানতে পারলো যে 'x' নামক খলীফা ছিল একটি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দৃঢ় হস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করেন। আরবী লিপির উৎকর্ষ সাধন, আরবি মুদ্রার প্রচলন এবং ডাক বিভাগের সংস্কার তাঁর শাসনামলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক।

ক) উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ? ১
খ) খলীফা আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন ? ২
গ) উদ্দীপকের 'x' নামক খলীফার রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে লিখুন। ৩
ঘ) 'x' নামক খলীফা উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা উক্তিটি মূল্যায়ণ করুন। ৪

পাঠ-৭.৫ আল-ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তার ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলীফা ওয়ালিদের ক্ষমতায় আরোহণ ও পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- আল-ওয়ালিদের কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আল-ওয়ালিদের কৃতিত্ব বিচার করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মসজিদে নববী, মুহাম্মদ বিন কাসিম, সাম্রাজ্যবাদীনীতি, নিষ্ফল বিজয়, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্র, সামন্তরাজাগণ, ভূমিদাস ও জিব্রালটার**

পরিচয় ও ক্ষমতায় আরোহণ

আল-ওয়ালিদ ছিলেন খলীফা আব্দুল মালিকের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে আল-ওয়ালিদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হিজরী ৫০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। আল-ওয়ালিদ পিতার পদাংক অনুসরণ করেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে বহাল রাখেন এবং তার ধর্মপ্রাণ চাচাতো ভাই ওমর বিন আব্দুল আযীজকে হেজাযের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করেন। গৃহযুদ্ধের সময় মক্কা ও মদীনায় যে ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো তিনি তা পূরণে অগ্রগামী হন। তিনি উভয় শহরে ব্যাপক সংস্কার সাধন ও বহু অট্টালিকা, প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করেন এবং পবিত্র কাবা ঘর পুণঃনির্মাণ করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

খলীফা আল-ওয়ালিদ মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন। তিনি ছিলেন ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা। তার সময়ে মধ্য এশিয়া, সিন্ধু, স্পেন মুসলিম পদানত হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিফ বিন জিয়াদ, মুসা ইবনে নুসাইর ও কুতায়বা বিন মুসলিম এই বীর যোদ্ধাগণ অপরিসীম রণকৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

মধ্য এশিয়া বিজয়

কুতায়বা বিন মুসলিম এর পরিচালনায় মুসলিম বাহিনী মধ্য এশিয়া বা অক্সিয়ানায় অভিযান পরিচালনা করে। কুতায়বা বলখ, তুখারিস্তান, বুখারা, খাওয়ারিজম প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে। এই অঞ্চলে ছিল তখন তুর্কিদের আধিপত্য। কুতায়াবা ৭০৬ খ্রি: একে একে বলখ, তুখারিস্তান ও ফারগানা অভিযান পরিচালনা করেন। মুসলিম বাহিনী এই সকল অঞ্চল তাদের পদানত করে। ৭০৯ খ্রি: তুখারিস্তানে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭১০ থেকে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সমরকন্দ ও খাওয়ারিজম পদানত হয়। খাওয়ারিজমের শাহ মুসলিমদের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হন। কুতায়বা ৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খোজান্দা, শাশ্, ফার্গনা ও কাশ্গড় দখল করে চীন সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ইতিমধ্যে খলীফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যু সংবাদ পৌছালে তার অভিযান স্থগিত হয়ে যায়।

চিত্র: আরব সাম্রাজ্য (৬২২-৭৫০ খ্রি.)

অভিযানের কারণসমূহ :

আল-ওয়ালিদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি

মধ্যযুগের সকল শাসকের ন্যায় আল-ওয়ালিদ সিংহাসনে বসেই সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর রাজ্য বিস্তারের অংশ হিসেবে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ভারতের ঐশ্বর্য

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ ধন-সম্পদে ঐশ্বর্যশালী। উপকূলীয় বাণিজ্য এই উপমহাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও এই অভিযান প্রেরিত হয়। এছাড়া কাবুল ও কান্দাহারের ভারতীয় রাজাগণ মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন।

দাহির কর্তৃক বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান

আরব বিদ্রোহীগণ, বিশেষ করে হাজ্জজ বিন ইউসুফের অধীনে ইরাকের বিদ্রোহীগণ পালিয়ে সিন্ধু প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরকে তাদের ফিরিয়ে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

আরব জাহাজ লুণ্ঠন

সিংহলের রাজা কর্তৃক খলীফা আল-ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জন্য প্রেরিত উপহার, উপঢৌকন সম্বলিত ৮ টি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ এর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু রাজা দাহির এই দায় অস্বীকার করেন। এই সমস্ত কারণে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরিত হয়।

অভিযানের বর্ণনা

তুর্কিদের পূর্বেই সিন্ধু বা ভারতীয় উপমহাদেশ আরবদের পদানত হয়েছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন খলীফার পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি খলীফার প্রতিনিধি হয়ে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে উবায়দুল্লাহ ও বুদায়েলের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযান ২টি ব্যর্থ হয়। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ও ভ্রাতষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক পরিচালিত অভিযানটি সফল হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১০-৭১২ খ্রি: সিন্ধু অভিযানটি পরিচালিত করেন। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে ৬০০০ উষ্ট্রারোহী, ৬০০০ সিরীয় অশ্বারোহী এবং ২০০০ ভারবাহী পশু। মুহাম্মদ বিন কাসিম পাকিস্তানের মাকরান প্রদেশ দিয়ে দেবলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মাকরানের শাসক হারুন তাকে সৈন্যসামন্ত ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। দাহিরের কুশাসনে বহু নিম্ন হিন্দুজাত যেমন জাট ও মেঠ স্বেচ্ছায় মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথমে দেবলের শাসক রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরাজিত করেন এবং দেবল অধিকার করেন ৭১১ খ্রিস্টাব্দে। এরপর মুহাম্মদ সিরওয়ান নামক শহরটি দখল করেন। আল-নিরুন (আধুনিক হায়দারাবাদ) সিস্তান শহর দুটি দখল করা হয়। রওয়ার নামক স্থানে রাজা দাহিরের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। বিশাল হস্তীবাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে রাজা দাহির শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। দাহির পত্নী-রানী বাঈ ১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে আরোরা দুর্গ থেকে যুদ্ধ করেন কিন্তু তিনি পরাজিত হয়ে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন। এরপর মুসলমানগণ বিনা বাধায় ব্রাহ্মণাবাদ দখল করেন এবং ৭১৩ খ্রি: মুলতান অধিকৃত হয়। কিন্তু এই সময় দামেস্ক হতে খলীফার মৃত্যুর সংবাদ গিয়ে পৌছে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর অভিযান স্থগিত ঘোষণা করেন।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল :

১. রাজনৈতিক ফলাফল

ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "আরবদের সিন্ধু বিজয় প্রাক-ভারত এবং ইসলামের ইতিহাসে একটি আখ্যায়িকা মাত্র। এটি ফলবিহীন বিজয় উল্লাসের নামান্তর। লেনপুলের এই অভিমত শুধু একদিক দিয়ে সত্য। সিন্ধুতে আরবদের শাসন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এবং এ বিজয় শুধু সিন্ধু ও মুলতানে ছিল। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এ বিজয় কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

২. ধর্মীয় ফলাফল

ধর্মীয় দিক হতে এই অভিযানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী, আরব সেনাবাহিনীর সাথে আরব বণিক ও সুফী দরবেশগণ সিন্ধু অঞ্চলে আসেন। তাঁরা ইসলাম প্রচার করেন এবং অনেকে এই অঞ্চলে বিবাহ করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তাদের মাধ্যমেই এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে।

৩. সাংস্কৃতিক ফলাফল :

সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এই অভিযানের সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল। আরবরা ভারতীয় গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাই এই বিজয় সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল ছিল বলা যায় না।

আফ্রিকা বিজয় :

হাসান বিন নুমানের মৃত্যুর পর মুসা ইবনে নুসাইর আফ্রিকা অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। বার্বারগণ তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের যুগে ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল। তিনি তাদেরকে পরাজিত করে আটলান্টিক সাগরে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত মুসলিম আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। তিনি ভূ-মধ্যসাগরে বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং নৌবহরের সাহায্যে মেজর্কা, মাইনরকা, ইভিকা প্রভৃতি ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করেন।

স্পেন বিজয়

বিজয় প্রাক্কালে স্পেনের অবস্থা :

১) রাজনৈতিক অবস্থা : স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল গৃহবিবাদে পূর্ণ। উচ্চভিলাষী ও অত্যাচারী সামন্তরাজা ডিউক রডারিক স্পেনীয় সিংহাসনের রাজা উইটিজাকে পদচ্যুত ও হত্যা করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন। স্পেনে তখন ছিল গথিক রাজাদের শাসন। অভিজাত শ্রেণি ছিল আপন স্বার্থসচেতন ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল খুবই দুর্বল। তাদের মাঝে কোন ঐক্য ছিল না।

২) সামাজিক অবস্থা : সমাজব্যবস্থা ছিল ৩টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত।

i) আভিজাত্য সম্প্রদায় : রাজা, গীর্জার পাদ্রি ও সামন্তরাজাগণ। এদের কোন প্রকার কর দিতে হতো না।

ii) মধ্যবিত্ত শ্রেণি : যারা সমাজের মধ্যভাগে অবস্থান করতো। তাদেরকে সকল প্রকার করা প্রদানে বাধ্য করা হতো।

iii) তৃতীয় শ্রেণি ছিল দাস : তারা ছিল ভূমিদাস (Serf) এবং ব্যক্তিগত ক্রীতদাস। যাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাদের-কে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হত না।

৩) ধর্মীয় অবস্থা : সমাজে কোন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল না। ইহুদীরা ছিল নির্যাতিত। তাদের ধর্মীয় কোন স্বাধীনতা ছিল না। চার্চের প্রাধান্য ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে।

স্পেন বিজয়ের কারণসমূহ :

১. স্পেনের গথিক রাজার দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকেই উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সকল ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও অত্যাচারিত মানুষ মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেনে অভিযান প্রেরণে অনুপ্রাণিত করেন।

২. অপর দিকে স্পেন বিজয় ছিল খলীফা আল-ওয়ালিদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির একটি অংশ।

৩. সিউটার শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান ছিল মৃত ও সিংহাসনচ্যুত রাজা উইটজার জামাতা। কাউন্ট জুলিয়ান তাই স্পেনের সিংহাসনকে শত্রুমুক্ত করতে চেয়েছিলো এবং মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেনে আহবান করেন।

৪. এই অভিযানে কাউন্ট জুলিয়ান মুসলিম সেনাবাহনীকে সর্বাত্মক সাহায্য করেন। যুদ্ধ জাহাজ, প্রয়োজনীয় রসদ ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন।

৫. কাউন্ট জুলিয়ানের সর্বাত্মক সহযোগিতার পেছনে রয়েছে তার কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রডারিক কর্তৃক অবমাননা। তাই এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাউন্ট জুলিয়ান মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন বিজয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

ঘটনা প্রবাহ :

মুসা ইবনে নুসাইর প্রথমে তার অনুচর তারিফকে স্পেনে প্রেরণ করেন। তারিফ ফিরে এসে তাঁকে আক্রমণের অনুকূল পরিবেশের কথা ব্যক্ত করেন। এরপর মুসা আর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ও সেনাপতি বার্বার যোদ্ধা তারিক বিন যিয়াদকে ৭১১ খি: স্পেন অভিযানে প্রেরণ করেন। এই সময় ৭০০০ সৈন্য নিয়ে তারিক যে পাহাড়ে অবতরণ করেন তা 'জাবাল আল তারিক' (তারিকের পাহাড়) নামে পরিচিত হয়। ইউরোপীয়দের নিকট এটি জিব্রালটার নামে পরিচিত। ৭১২ খ্রি: মেডিনা-সিডোনিয়া নামক স্থানে গোয়াদালকুইভার নামক নদীর তীরে তারিক রডারিকের বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই সময় মুসা ইবনে নুসাইর ৫০০০ সৈন্য সাহায্য পাঠালে তারিকের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,০০০ এবং রডারিকের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১,২০,০০০ যুদ্ধে রডারিক পরাজিত হন এবং পলায়নকালে গোয়া ডিলেট নদীতে নিমজ্জিত হয়ে মারা যান। মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করলো। তারিক তাঁর সেনাবাহিনীকে চারভাগে বিভক্ত করে যথাক্রমে মালাগা, গ্রানাডা,

কর্ডোভায় পাঠালেন এবং নিজে রাজধানী টলেডো দখল করলেন। তারিকের সাফল্যে মুসা ঈর্ষান্বিত হয়ে ৭১২ খ্রি: তিনি স্পেন আগমন করেন এবং সেভিল, মেরিডা, কারমোনা প্রভৃতি শহর জয় করে টলেডোর নিকট তারিকের সাথে মিলিত হন। তাদের মিলিত বাহিনী সারাগোসা, টেরাগোনা, আরাগোনা, বার্সালোনা, লিও প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে। এই সময়ে খলীফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যুসংবাদ তাদের নিকট পৌছালে তারা দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন।

স্পেন বিজয়ের ফলাফল :

সমাজে সমতা ও ন্যায়নীতির প্রবর্তন

আরবদের কর্তৃক স্পেন বিজয় ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। অত্যাচার-অবিচারের পরিবর্তে সমাজে সাম্য ও ন্যায়বচিার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

আরবদের কর্তৃক স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বীকৃত হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল অনাচার -অবিচার সমাজ হতে তিরোহিত করা হয়।

দাসদের মর্যাদা

সমাজে দাস ও ভূমিদাসগণ স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ পায়। সামাজিকভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ পায়।

যাজক শ্রেণির ক্ষমতা হ্রাস

সমাজের উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণির বিশেষ করে যাজক শ্রেণির ক্ষমতার রাশ টেনে ধরা সম্ভব হয়। মুসলিম বিজয়ের পর যাজক শ্রেণির শোষণের হাত থেকে স্পেনীয়রা মুক্তি পায়।

কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্য

মুসলমানগণ স্পেন বিজয়ের পর সেখানকার কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্যে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এবং এই ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়।

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

স্পেন বিজয়ের পর সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসা ইবনে নুসাইর তাঁর পুত্র আব্দুল আযিযকে স্পেনের, আব্দুল্লাহকে ইফ্রিকিয়ার ও আব্দুল মালিককে মরক্কোর শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন।

শিল্প সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান

মুসলমান কর্তৃক স্পেন বিজয়ের ফলে এখানে শিল্প, সাহিত্যের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচর্চা ও বিকাশ ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে গোটা ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

আল ওয়ালিদের মৃত্যু

খলীফা আল ওয়ালিদ ১০ বছর গৌরবের সাথে রাজত্ব করার পর ৭১৫ খ্রি: মৃত্যুবরণ করে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন কিন্ত তাঁর পুত্র তার জীবদ্দশায় মারা যান। তাই তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান তার মৃত্যুর পর দামেস্কের সিংহাসন আরোহণ করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব :

দয়ালু ও সুযোগ্য শাসক

সৈয়দ আমীর আলী বলেন- তিনি যে তার পিতা আব্দুল মালিক ও পিতামহ মারওয়ান অপেক্ষা দয়ালু ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এটা নিশ্চিত যে, তার বংশধরগণের অনেকের চেয়ে তিনি হৃদয়বান ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকগণ তাঁকে স্বেচ্ছাচারি বললেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দয়ালু ও একজন সুযোগ্য শাসক।

উমাইয়া ইতিহাসের স্বর্ণযুগ

আল-ওয়ালিদ ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা যার রাজত্বকাল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা

আল-ওয়ালিদ কেবল উমাইয়া বংশেরই নন সমগ্র মুসলিমদের ইতিহাসে অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা। তিনি অক্সাস নদী হতে সিন্ধু নদ, উত্তর আফ্রিকা হতে স্পেন পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সমসাময়কি রাজণ্যবর্গের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

জনহিতকর কার্যাবলি

তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন এবং কূপ খনন করেন। সীমান্ত রক্ষার জন্য দূর্গ নির্মাণ করেন । বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন। দুস্থদের জন্য আশ্রয়স্থল তৈরি করেন। তিনি অসহায় ও দুস্থদের রাষ্ট্র হতে ভাতা প্রদান করতেন। অসহায়, পঙ্গু, অন্ধ, পাগল, ও অক্ষম লোকদের জন্য তিনি আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এতিম বালক বালিকার জন্য এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থাপত্যবিদ্যা

আল-ওয়ালিদ ছিলেন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদ। দামেস্কের জামে মসজিদ তার স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম নির্দশন। এছাড়াও তিনি মক্কা ও মদীনায় মসজিদ সংস্কার করেন যে শহরে মসজিদ ছিল না সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

আল-ওয়ালিদ শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর দরবারে কবি ও সাহিত্যিকদের বিশেষ সমাদার করা হতো। কবি ফারায্দাক তার দরবার অলংকৃত করেন। খলীফা নিজে ছিলেন কবি ও সঙ্গীতানুরাগী। তাঁর সময়ে কুফায় ও বসরায় জ্ঞান বিজ্ঞান ও হাদীস চর্চা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর সময়ে মক্কায় কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নৌ-বহরের উন্নতি

আল-ওয়ালিদ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সামরিক সংগঠক। তিনি নৌ-বহরের উন্নতি সাধন করেন যা ভূ-মধ্যসাগরে রোমানদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করেছিলেন।

সারসংক্ষেপঃ

আল-ওয়ালিদ আব্দুল মালিকের একজন যোগ্যতম উত্তরসূরি এবং উমাইয়া বংশের একজন শ্রেষ্ঠতম শাসক। তাঁর সময়েই ইসলামী রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। তিনি উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, সিন্ধু ও মধ্য এশিয়ায় ইসলামী পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রেষ্ঠতম সেনাপতিগণ ছিলেন তার সাফল্যের কারিগর। স্থাপত্য ও প্রশাসনে তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির নৃপতি। তাই তিনি শুধু উমাইয়া বংশের নয় তিনি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও বিজেতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আরবরা স্পেন বিজয় করে কত সালে ?

ক) ৭১৫ খ) ৭০৫ গ) ৭১২ ঘ) ৭১৩

২. খলীফা আল ওয়ালিদ স্পেনে অভিযান প্রেরণ করেন -

ক) অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য খ) সাম্রাজ্যবাদীনীতির অংশ হিসেবে

গ) স্পেনীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ছিল ঘ) সামরিক শক্তি প্রদর্শন করতে

৩. খলীফা আল ওয়ালিদের সময় মুসলিমরা জয় করে -

i) সিন্ধু ii) চীন iii) স্পেন

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii, iii খ) i, iii গ) i, ii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

'ইসলামের সম্প্রাসারণে খলীফাদের অবদান' শীর্ষক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন- খলীফা উমর (রা.) এর পরে উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য অধিক বিস্তৃত হয়। তিনি তার সুযোগ্য গভর্ণরদের দ্বারা মধ্য এশিয়া, সিন্ধু, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন জয় করতে সক্ষম হন। জনহিতকর কাজের জন্যও ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক চিরস্মরণীয়।

ক) ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর কে ছিলেন? ১

খ) "জনহিতকর কাজের জন্য ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক চিরস্মরণীয়"-ব্যাখ্যা করুন ? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত খলীফার সময়ে সিন্ধু বিজয়ের ঘটনাটি তুলে ধরুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খলীফার চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৭.৬ উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এর শাসননীতি, সংস্কার ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এর পরিচয় ও ক্ষমতায় আরোহণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)- এর শাসন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এর সংস্কার, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পর্কে জানতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**প্রজাবৎসল, হাশেমী নীতি, লানত ও অভিসম্পাত, মজলিস-ই-শুরা, পীরেনীজ পর্বত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পঞ্চম খলীফা ও 'উমাইয়া সাধু খলীফা'**

পরিচয় :

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) ছিলেন মারওয়ানের দৌহিত্র। তাঁর মাতা ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর দৌহিত্রী উম্মে হামিম। তিনি ছিলেন খলীফা আব্দুল মালিকের ভাই ও মিসরের শাসনকর্তা আব্দুল আযীযের পুত্র। তিনি আব্দুল মালিকের কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করেন। ইতিহাসে তিনি ২য় উমর হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত।

ক্ষমতায় আরোহণ

খলীফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলাইমান খলীফা হন। তিনি প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন। তাঁর রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কোন সামরিক বিজয় সম্ভব হয়নি। তিনি মাত্র ২ বছর ৮ মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সৎ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী তাঁর চাচাতো ভাই উমর ইবনে আব্দুল আযীযকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করেন। ৭১৭ খি. উমর ইবনে আব্দুল আযীয দামেস্কের সিংহাসণ আরোহণ করেন।

শাসননীতি :

নিরপেক্ষ ও প্রজাবৎসল

খলীফা ২য় উমর (রা.) একজন প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। রাজ্য জয়ের পরিবর্তে তাঁর সাম্রাজ্যে বসবাসকারী প্রজাদের কল্যাণসাধনকেই তিনি তার পরম দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি শাসনকার্যে ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ করেছিলেন। তাদের কর্মকাণ্ডের উপর কড়া নজর রাখতেন। ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লাব ও আল-হুরকে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য পদচ্যুত করেন।

অনাড়ম্বর জীবন

তিনি খিলাফত লাভের পর তার সকল সম্পত্তি রাজকোষে জমা করেন। তিনি খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি অনুসরণ করে দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন। তার নির্দেশে তদ্বীয় স্ত্রী তার পিতা ও ভ্রাতা কর্তৃক প্রাপ্ত মূল্যবান অলংকার রাজ কোষে জমা করেন। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করে দেন এবং রাজ অশ্বশালার অশ্ব বিক্রি করে জনকল্যাণে ব্যয় করেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

বায়তুল মাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা

তিনি বায়তুল মালকে জনগণের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

হাশিমী নীতি

খলীফা ২য় উমর হাশেমীয় বংশের প্রতি উদার ছিলেন। তিনি শুক্রবারের খুৎবায় হযরত আলীর নামে পঠিত লানত ও অভিসম্পাত বন্ধ করে দেন। তিনি মারওয়ান কর্তৃক দখলকৃত ফিদাক নামক খেজুরবাগানটি মুহাম্মদ (সা.) এর পরিবারের লোকদের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি তালহার সম্পত্তি যা আব্দুল মালিক কর্তৃক দখলকৃত হয়েছিল, তা তালহার বংশধরকে ফিরিয়ে দেন।

মজলিস-আল-শুরা

শাসন ক্ষেত্রে তিনি মজলিস-আল-শুরা অনুসরণ করতেন যা তার পূর্বসূরীরা স্থগিত করেছিল।

খারিজী নীতি

খলীফা ২য় উমর (রা.) খারিজীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করেন। তাঁর এই নীতির ফলে তাঁর সময়ে খারিজীগণ কোন বিদ্রোহ করেনি। খারিজীগণ একমাত্র ২য় উমর (রা.)কেই উমাইয়া বংশের খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

অমুসলিম নীতি

খলীফা ২য় উমর (রা.) অমুসলিমদের প্রতিও উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অমুসলিমগণ তাঁর সময়ে রাজকার্যে নিয়োগ পেতেন। তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদীদের গীর্জা ও উপাসনালয় তাদের নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি নায্‌রান, আইলা ও সাইপ্রাসের খ্রিস্টানদের বার্ষিক করের বোঝা হ্রাস করেন।

মাওয়ালী নীতি

খলীফা ২য় উমর মাওয়ালীদের (অনারব মুসলিম) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি থেকে দূরে সরে আসেন। তাদের প্রতি বৈষম্য দূর করেন। তিনি তাদের উপর আরোপিত খারায ও জিযিয়া কর লাঘব করে দেন। তিনি মাওয়ালীদের ভাতা প্রদান করেন।

সংস্কারসমূহ :

ধর্মীয় সংস্কার

রাষ্ট্র সম্প্রসারণ অপেক্ষা ইসলাম সম্প্রসারণে খলীফা ২য় উমর বেশি মনোযোগী হন। তিনি মাওয়ালীদের উপর বাড়তি জিযিয়া ও খারায ন্যায়ানুগভাবে আরোপ করেন। মুসলিমদের ন্যায় তাদেরকে সকল রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। এই নীতির ফলে খোরসান, বোখারা, সমরকন্দ, খাওয়ারিজম, নিশাপুর প্রভৃতি জায়গায় ইসলাম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। আফ্রিকার বার্বার জনগোষ্ঠীর মাঝেও ইসলাম ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করে। তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন প্রকার গোঁড়ামির আশ্রয় নেননি বরং তিনি ছিলেন সকল ধর্মের প্রতি উদার। তিনি তাঁর রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শাসননীতি প্রবর্তন করেছিলেন।

রাজস্বনীতি

অমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি মাওয়ালীদের উপর হতে জিযিয়া ও খারায মওকুফ করেন। এর ফলে রাজকোষে অর্থসংকট দেখা দেয়। তাই রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্ব করেন। নও মুসলমানগণ ১/১০ অংশ উশর রাজস্ব প্রদান করতো যা পূর্বে তাদের উপর ১/৫ খারায হিসেবে ধার্য ছিল। তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, ১০০ হিজরীর পরে অমুসলমানগণ মুসলিমদের নিকট খারায ভূমি বিক্রয় করতে পারবে না। মুসলমানগণ সকল প্রকার কর হতে মুক্ত ছিল এবং অমুসলমানগণ কর প্রদানে অনিচ্ছার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাই তিনি ভূমিদখলকারী প্রত্যেক মুসলিম ও অমুসলিমের উপর খারায আরোপ করেন। তিনি সকল অমুসলিমকে রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য জিযিয়া কর বাধ্যতামূলক করেন।

বৈদেশিক নীতি :

স্পেনের শাসন

স্পেনে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য খলীফা উমর আস-সামকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে বহু জনহিতকর কার্যাবলি যেমন- ভূমি জরিপ, আদমশুমারি, সেতু, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন। তিনি সারাগোসায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বিদ্রোহী খ্রিস্টানদের হুমকি প্রতিহত করার জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ দখল করেন। আস-সামের মৃত্যুর পর আব্দুর রহমান মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উমর ইবনে আব্দুল আযীয ছিলেন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ উমাইয়া খলীফা। তিনি ছিলেন সরল, আদর্শবান ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবন ও শাসনপ্রণালীতে খোলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ অনুসরণ করতেন। তিনি ইসলামের মৌলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান জীবন যাপন করতেন। প্রজাদের কল্যাণ সাধনই ছিল তার শাসননীতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এজন্যই ইসলামের ইতিহাসে তাকে পঞ্চম খলীফা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। তিনি 'উমাইয়া সাধু খলীফা' (Pious Caliph of the Umayyah) নামে পরিচিত। তার সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হয়। মাওয়ালী ও অমুসলিমগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হন। প্রজাগণ সুখে

শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। Syed Ameer Ali বলেন, æThe reign of Omar forms the most attarctive period of the Ommeyade dominion."

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রা.) উমাইয়া বংশের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল নাম। তাঁর রাজত্বকালে ছিল উমাইয়া বংশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে শাসনক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসননীতি ও ইসলামের আদর্শকে মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের 'পঞ্চম খলীফা' হিসেবে পরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদাসয় অনাড়ম্বর, উদার ও আদর্শবান একজন শাসক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও

১. 'উমাইয়া সাধু' কার উপাধি ?

ক) আল-ওয়ালিদ খ) উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) গ) মুয়াবিয়া (রা.) ঘ) আব্দুল মালিক

২. খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) আলীপন্থীদের প্রতি সদাচরণ করেন কিভাবে ?

ক) কর রহিত করে খ) অভিসম্পাত বন্ধ করে গ) অর্থ প্রদান করে ঘ) খারায রহিত করে

৩. খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রা)-

i) বায়তুল মাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন
ii) ইসলামী রাষ্ট্রকে সম্প্রসারিত করেন
iii) নৌ-বাহিনী গঠন করেন

নিচের কোনটি সঠিক -

ক) i, iii খ) i গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আসিফ ও নাফিস উমাইয়া খলীফাদের সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আসিফ বলল, উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) ছিলেন সবচেয়ে ধার্মিক। তিনি ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসেবে পরিচিত। নাফিস বলল, তিনি তাঁর ব্যাতিক্রমী শাসননীতি ও শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্কারের জন্য ও সুপরিচিত।

ক) উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) কত সালে সিংহাসন আরোহণ করেন ? ১

খ) উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) কে 'পঞ্চম ধার্মিক খলীফা' বলা হয় কেন ? ২

গ) উদ্দীপকে নাফিসের মতানুসারে উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) এর শাসন নীতি আলোচনা করুন। ৩

ঘ) খলীফা হিসেবে ২য় উমরের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৭.৭ হিশামের শাসন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিশামের রাজত্বকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- হিশামকে কেন উমাইয়া বংশের শেষ রাজনীতিবিদ বলা হয় তা নিরুপণ করতে পারবেন।
- হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হৃত-গৌরব, 'মূর্তির যুদ্ধ', 'সম্ভ্রান্তদের যুদ্ধ', টুরস যুদ্ধ, ভাগ্যনিয়ন্ত্রক যুদ্ধ।**

পরিচয়

খলীফা আব্দুল মালিকের চতুর্থ পুত্র ছিলেন হিশাম। ৭২৪ খ্রি: দুর্বল শাসক দ্বিতীয় ইয়াযিদের মৃত্যুর পর হিশাম দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ কর্মদক্ষ খলীফা।

সমস্যা ও সংকট

হিশাম সিংহাসনের আরোহণ করে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সময় উমাইয়া ও হাশিমী দ্বন্দ্ব, খারিজী বিদ্রোহ, বার্বার ও রোমানদের হুমকি এবং সর্বোপরি আব্বাসীয় আন্দোলন উমাইয়া খিলাফতকে সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। এ সকল সংকট নিরসন করে উমাইয়া হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

হিশামের নীতি

একমাত্র ২য় উমর ছাড়া উমাইয়া বংশের সকল খলীফা কোন না কোন দলীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব এভাবে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতো। খলীফা ২য় ইয়াযিদ মুদারীয়দের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাই তাদের প্রাধান্য খর্ব করার জন্য হিশাম হিমারীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

প্রশাসনিক রদবদল

পূর্ববর্তী খলীফার অযোগ্য শাসনের ফলে অযোগ্য রাজকর্মচারী ও মন্ত্রীর কুশাসনে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা যায়। হিশাম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে প্রশাসনিক রদবদল করেন। ইরাকে উমর বিন হোবায়রাকে অপসারণ করে তার স্থলে খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল কাসরীকে নিয়োগ করেন। খালিদ এর ভ্রাতা আসাদ আল কাসরীকে খোরাসানে নিয়োগ করেন।

ইরাকে বিদ্রোহ দমন

ইরাকের শাসক খালিদ কৌশলে হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব প্রশমিত করেন। তিনি খারিজী বিদ্রোহ প্রশমিত করেন। অমুসলমানগণ ও তার শাসনে আস্থাভাজন হন। কিন্তু খলীফা তার সুশাসন সত্ত্বেও অর্থ আত্মসাৎ অথবা আলী (রা.) এর বংশধরদের প্রতি উদারতার জন্য তাকে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে ৭৩৯ খ্রি: ইউসুফ বিন উমরকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তার শাসনকালে যায়িদ নামক হযরত আলী (রা.) এর বংশধর কুফায় খিলাফত দাবি করলে ইউসুফ তাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

খোরাসানে বিদ্রোহ দমন

জিযিয়া থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমু-দরিয়ার পূর্বদিকের অবস্থিত সাগোদের অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য হলে তারা ইসলাম ত্যাগ করেন এবং বিদ্রোহ ঘোষাণা করেন। এই সময় ৭৩৫ খ্রি: আসাদ আল কাসরী তার জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা খালিদ আল-কাসরী কর্তৃক নিয়োজিত হন। ৭৩৬ খ্রি: আসাদ সাগোদের বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করেন। তিনি তুর্কি উপাজতি নেতা খানকেও পরাজিত ও নিহত করেন। আসাদ বলখে

খোরাসানের রাজধানী স্থাপন করেন। আসাদ অচিরেই মৃত্যুবরণ করেন এবং তার স্থলে নসর বিন সাইয়্যারকে গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। নসর ছিলেন সর্বশেষ উমাইয়া গভর্ণর। তিনি মার্ভে খোরাসানের রাজধানী স্থাপন করেন।

উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ দমন

হিশামের খিলাফতের প্রাথমিককালে উত্তর আফ্রিকায় শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু একদল খারিজী উত্তর আফ্রিকায় গমন করে বার্বারদের সহায়তায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা ৭৩৮ খ্রি: তাঞ্জিয়ারের শাসনকর্তাকে নিহত করে এবং কায়রোয়ান দখল করে। আরব সেনাপতি হাবীব পরাজিত ও নিহত হন আরো বহু বীরযোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হন। তাই এইযুদ্ধে 'সম্ভ্রান্তদের যুদ্ধ' (Battle of the Nobles) বলা হয়। খলীফা সেনাপতি কুলসুম কে প্রেরণ করলে তিনিও পরাজিত ও নিহত হন। এই অবস্থায় ৭২৪ খ্রি: হিশাম সেনাপতি হানজালাকে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 'মূর্তির যুদ্ধে' (Battle of Idols) এ হানজালা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

মধ্য-এশিয়ায় অভিযান

ককেশাস পর্বতের উত্তরে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান প্রদেশে খাজার তুর্কিগণ বসবাস করত। ৭৩১ খ্রি: তারা মসুল আক্রমণ করে এর গভর্ণর জার্‌রাকে পরাজিত ও নিহত করে। হিশাম সাঈদ আল-হাবশীকে বিপুল সৈন্যসহ খাজারদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খাজারগণ তার নিকট পরাজিত হয়। ৭৩২ খ্রি: খলীফা তাঁর ভ্রাতা মাসলামাকে পরের বছর ও মারওয়ানকে যথাক্রমে আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মাসলামা খাজারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। মারওয়ান খাজারদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করেন। পরবর্তী উমাইয়া ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় মারওয়ান নামে খ্যাত।

স্পেন ও ফ্রান্সের ঘটনাবলী

দামেস্ক হতে স্পেনের দূরত্ব অধিক হওয়ায় উত্তর আফ্রিকা হতে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হতো। ৭২০ সালে তুলুসের যুদ্ধের পর আরব সেনাপতি আনবাসাহ স্পেনের শাসকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি প্রশাসনিক কাজে দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু পীরেনীজ গিরি সংকটে তিনি ফ্রান্সের বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এর ফলে স্পেনে ৬ বছর যাবৎ বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। অবশেষে হিশাম ৭৩১ খ্রিস্টাব্দে আব্দুর রহমান আল-গাফিকীকে স্পেনে পাঠান। এই সময় পীরেনীজ পর্বতের অপর প্রান্তে সাগোদে আরব শাসনকর্তা মনুজা একুইটেনের ডিউক ইউডিজের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করে শ্বশুরের সাথে আরব শাসনের বিরোধিতা শুরু করেন। মনুজা আব্দুর রহমানে নিকট পরাজিত ও নিহত হন। ইউডিজ ফ্রানকিস রাজা চার্লস মারটেলের সহায়তায় আব্দুর রহমানকে বাঁধা দেন। ৭৩২ খ্রি: টুরস নামক স্থানে উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। দলীয় কোন্দল, বিশৃঙ্খলা, সেনাপতির আদেশ অমান্য ও ভুল সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদি কারণে মুসলমানগণ এই যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। সেনাপতি আব্দুর রহমান যুদ্ধে পরাজিত হন। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ভাগ্যনিয়ন্ত্রক যুদ্ধ।

আব্বাসীয় বিদ্রোহ

এই সময়ে আব্বাসীয়গণ উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আবু মুসলিম খোরাসানী নামক এক ইস্পাহানবাসী হযরত আব্বাস (রা.) এর বংশধর মুহাম্মদ ও তার পুত্র ইব্রাহীম এর পক্ষে খোরাসান অঞ্চলে প্রচারণা শুরু করেন। খলীফা হিশাম এই আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন।

হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব :

শাসনদক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

খলীফা হিশাম ২০ বছর রাজত্ব করেন। তিনি যে সময়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন তখন সর্বত্র ছিল গোত্রীয় কলহ, খারিজী ও বার্বার বিদ্রোহ, খাজার বিদ্রোহ ও স্পেনে সংকট। এই সময় আব্বাসী আন্দোলন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। এই সংকটজনক অবস্থায় তিনি কঠোর অবস্থানে থেকে একে একে সকল বিদ্রোহ দমন করেন। তার পূর্বসূরী ২য় ইয়াযীদের সমর্থকদের প্রভাব তিনি বহুলাংশে কমিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ রাজনীতিবিদ। তার মাধ্যমে উমাইয়া গৌরব যুগের অবসান ঘটে। এই প্রসংগে P.K Hitti বলেন, æWith Hisham (724-43), the fourth son of 'Abd-al-Malik, the Umayyad golden age came to a close."

সন্দেহপরায়ণ ও ধনলিপ্সা

শাসক হিসেবে তিনি সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। কাউকেই তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর সময়ে অনেক প্রশাসনিক রদবদল দেখা যায়। তাঁর অতিরিক্ত অর্থলিপ্সা পূরণের জন্য তিনি প্রজাদের উপর বাড়তি কর আরোপ করেন। এর ফলে জনগণ অসন্তুষ্ট হয় এবং আব্বাসীয় আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে।

ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ

ব্যক্তি জীবনে তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন তাঁর দরবার পাপাচার ও অন্যায় হতে মুক্ত ছিল। হিশাম রক্ষণশীল মুসলিম হিসেবে পরিচিত এবং ধর্মের ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতবাদ সহ্য করতেন না।

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

তিনি শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী সেলিম একজন বিখ্যাত ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি এরিস্টটলের কয়েকটি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। তাঁর পুত্র জাবালাও ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাস আরবিতে অনুবাদ করেন।

তিনি তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তিনি সুরম্য অট্টালিকা, বাগান ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। খ্রিস্টান ধর্ম যাজক স্টিফেন ছিলেন তাঁর একজন সহচর। এছাড়াও সঙ্গীতজ্ঞ হুনায়ন আল-হিরি তার অনুগ্রহ লাভ করেন।

সারসংক্ষেপঃ

হিশাম প্রায় ২০ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ রাজনীতিবিদ। তার বিশ বছরের শাসনকাল ছিল মূলত বিদ্রোহ ও বিশৃংখলায় ভরপুর। তিনি কঠোর হস্তে সকল বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু বিদ্রোহের স্থায়িত্ব ও প্রকৃতি এত কঠোর ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে উমাইয়াদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ধার্মিক ও প্রজারক্ষক। তিনি শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি উমাইয়া বংশের আসন্ন পতনকে কিছুটা হলেও রোধ করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন সর্বশেষ উমাইয়া রাজনীতিবিদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফা হিশাম কাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ?

ক) মুদারীয় খ) নাসারা গ) হিমারীয় ঘ) ইহুদী

২. হিশাম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে প্রশাসনিক রদবদল করেন -

ক) দুর্নীতি দূর করতে খ) বিদ্রোহ দমন করতে গ) ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে ঘ) কর বৃদ্ধি করতে

৩. খলীফা হিশামের সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা

i) আব্বাসীয় আন্দোলন ii) শিয়া বিদ্রোহ iii) উত্তর আফ্রিকায় খারিজী বিদ্রোহ

নিচের কোনটি সঠিক-

ক) i, ii, iii খ) i, iii গ) ii, iii ঘ) iii

৪. খলীফা 'x' উমাইয়া বংশের সর্বশেষ রাজনীতিবিদ। 'x' নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে।

ক) ২য় ইয়াযিদ খ) সুলায়মান গ) মারওয়ান ঘ) হিশাম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ফাহিমা তার পিতার কাছ থেকে জানতে পারলো যে, উমাইয়া বংশের একজন শাসক উমাইয়া বংশের পতনের পূর্ব মুহূর্তে পতনকে দীর্ঘায়িত করেন। তিনি পূর্ববর্তী দুর্বল শাসকের সময়ে সৃষ্ট নানা বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করেন। তিনি উমাইয়া বংশের সর্বশেষ রাজনীতিবিদ।

ক) খলীফা হিশামের কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন ? ১

খ) খলীফা হিশামের সময় আব্বাসীয় আন্দোলনের উল্লেখ করুন। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খলীফার সময়ে শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষতার বর্ণনা দিন । ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খলীফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৭.৮ উমাইয়া আমলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমাইয়া যুগের সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- উমাইয়া যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তুলে ধরতে পারবেন।
- উমাইয়া আমলের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ সমন্ধে বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**অভিজাত শ্রেণিবর্গ, বেদুইন, মুরজিয়া সম্প্রদায় ও দামেস্কের জামে মসজিদ**

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকাল অবসানের পর মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক ৬৬১ খ্রিঃ দামেস্কে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

উমাইয়া সমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্য :

অভিজাত সম্প্রদায় :

খলীফা, খলীফার পরিবারবর্গ, বিজেতাগণ, আমলাবর্গ, সম্ভ্রান্ত আরবগণ এই শ্রেণিভূক্ত ছিলেন। খলীফাগণ দামেস্কে বিলাস ব্যাসনের জীবন যাপন করতেন। প্রাসাদ ছিল মূল্যবান পাথর ও মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। কৃত্রিম ফোয়ারা ও জলপ্রপাত ছিল। খলীফা ও তার অভিজাত শ্রেণিবর্গ বিলাসী ও প্রমোদ-পূর্ণ জীবন-যাপন করতেন।

মাওয়ালী :

নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদেরকে মাওয়ালী বলা হত। মাওয়ালীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কোন আরব গোত্রভূক্ত হত। তারা উমাইয়াদের রাজ্য বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে অবদান রাখে।

যিম্মি :

মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রিত অমুসলিম প্রজাদের যিম্মি বলা হত। বাধ্যতামূলক সামরিক ও অন্যান্য দায়িত্ব থেকে জিযিয়া কর প্রদান করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভোগ করতো। তবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জিযিয়া কর প্রদান করতে হতো না।

দাস :

উমাইয়া যুগে দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধবন্দী হিসেবে সাধারণত দাসদের আগমন ঘটে। তারা খলীফা ও বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতো। তবে তাদের অবস্থা রোমান ও সাসানীয় সময় অপেক্ষা ভালো ছিল।

আমোদ-প্রমোদ :

উমাইয়া যুগে ভোগ বিলাস প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময়ে হেরেম প্রথা অত্যন্ত প্রসার লাভ করে। রাজধানী দামেস্ক পরিণত হয় সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। খলীফা ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ঘোড়দৌড়, পাশাখেলা, মোরগের লড়াই, দাবা ইত্যাদি খেলা প্রচলিত ছিল। উমাইয়া যুগের শেষভাগে পারস্য পোলো খেলার প্রচলন হয়।

নারীর অবস্থান :

উমাইয়া যুগে সমাজে নারীর বিশেষ মর্যাদা ছিল। রাজ পরিবারের নারীরা প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এ যুগে কয়েকজন বিদূষী নারীর কথা জনা যায়। মুয়াবিয়ার দুহিতা আতিকা ও আব্দুল মালিকের স্ত্রী আতিফা খলীফাদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। মদীনায় ইমাম হুসাইন (রা.) এর কন্যা সুকায়না (সখিনা) তায়েফের আয়শা বিনতে তালহা, মক্কার খার্ফা ও ওয়ালিদের স্ত্রী উম্মে বানিন ও তাপসী রাবেয়া ছিলেন এই যুগের গুণবতী ও প্রতিভাসম্পন্ন নারী।

বেশ-ভূষা :
উমাইয়া যুগে মুসলামনগণ জাঁকজমক ও সুদৃশ্য পোশাক পরিধান করতেন। সাধারণত ঢিলা পাজামা, লম্বা কোর্তা, সূক্ষ্ম মাথাওয়ালা জুতা ও পাগড়ী পরিধান করা হতো। বেদুইনরা কটিবদ্ধ ও কাঁধের উপর ছোট-ছোট চাদর ও মাথার উপর আবরণ ব্যবহার করতো। মহিলারা ঢিলা পাজামা কামিজ ও বড় রুমাল বা ওড়না ব্যবহার করতেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা :
উমাইয়াযুগ ছিল রাজ্য বিস্তারের যুগ। এই যুগে মুসলমানগণ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে বিজয় প্রতিষ্ঠা করে। উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল দিওয়ান আল-খারায নামক প্রতিষ্ঠানের উপর। বায়তুল মাল ছিল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোষাগার। বিজিত অঞ্চল হতে উমাইয়াগণ ব্যাপক রাজস্ব আদায় করতেন। তাদের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসগুলো ছিল: যাকাত, জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর, গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি, খারায বা অমুসলিমদের ভূমিকর, উশর বা মুসলিমদের ভূমিকর, উশুর বা বাণিজ্য কর, আল-ফে বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত কর ইত্যাদি।

কৃষি উৎপদান :
উমাইয়াগণ রাজ্য বিজয়ের ফলে প্রচুর অনাবাদি জমির মালিক হন। এ সকল জমিতে পানি সেচের মাধ্যমে ফসল ফলানোর কাজে অসংখ্য দাস শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। সিরিয়া, মিসর ও প্যালেস্টাইন অঞ্চলে উর্বর ভূমিতে প্রচুর কৃষি উৎপাদন ঘটে।

হস্তশিল্প :
উমাইয়া আমলে হস্তশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে এতে স্থানীয় কারিগর শ্রেণি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। হস্তশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গৃহস্থালী আসবাব, তৈজসপত্র, সোফা, ফুলদানি, ধাতব পাত্র, মুসাল্লা (জায়নামাজ) ও কার্পেট ইত্যাদি। পোশাক শিল্পও এই সময় ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

মুদ্রা ব্যবস্থা :
খলীফা আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম রাজকীয় টাকশাল নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক মুদ্রা তুলে নিয়ে আরবীতে নিজ নামে অঙ্কিত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রা জাল রোধ করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করেন।

শিল্প-সাহিত্য : স্থাপত্য ও সংস্কৃতি

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা :
সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি উমাইয়াগণ জ্ঞান বিজ্ঞানে ও শিল্প সাহিত্য চর্চায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। এই সময় গ্রীক, আর্মেনিয়া, রোমান, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। এটি ছিল মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনাকাল।

কুরআন-হাদীস চর্চা :
এই যুগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কুরআন ও হাদীস চর্চা শুরু হয়। এই কুরআন ও হাদীস চর্চা শুরু থেকেই পরবর্তীতে ফিকাহ শাস্ত্র বা মুসলিম আইনের জন্ম হয়। এই যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশরাদ ছিলেন ইমাম হাসান আল বসরী, শিহাব আল জুহুরী। কুফায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বহু হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে শারাহবিন ইমাম আবু হানিফার শিক্ষক ছিলেন।

আরবী ব্যাকরণ ও ইতিহাস চর্চা :
এই সময় বসরা ও কুফায় আরবী ব্যাকরণ চর্চা শুরু হয়। মূলত অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে ও অর্থ উদ্ধারে সহায়তার জন্য ব্যাকরণ চর্চা শুরু হয়। বসরার আবুল আসওয়াদ ছিলেন আরবী ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। ব্যাকরণবিদ খলিল আরবী ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করেন। তার শিষ্য সিবাওয়াই ছিলেন প্রথম আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনাকারী। উমাইয়া যুগের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ হচ্ছে আবিদ কর্তৃক রচিত কিতাবুল মুলক ওয়া আখবারুল মদীনা। কবি কায়িস ছিলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক।

কবিতা ও কাব্য সংস্কৃতি :
খলীফারা ছিলেন কবিতা ও কবির পৃষ্ঠপোষক। এযুগে রাজনৈতিক কবিতার জন্ম হয়। কবি মিসকিন আল দারিমী ইয়াযিদের খলীফা নির্বাচন সম্পর্কিত কবিতা রচনা করেন। হাম্মাদ জাহিলিয়া যুগের কবিতা সংকলনের জন্য খ্যাতি অর্জন

করেন। এছাড়া ছিলেন ফারাজদাক জারীর ও আল-আখতাল। তাঁরা চারণকবিতা, ব্যাঙ্গ কবিতা, প্রহসন রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবির উমর ইবনে রাবিয়া ও কবি জামীল প্রেমের কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

আইনশাস্ত্র বা ফিক্‌হ ও বিভিন্ন মতবাদ :

ইমাম আবু হানিফা, হাসান আল বসরী, এই যুগের শ্রেষ্ঠ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। এই সময় মুসলিম মনোজগতে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়। এই সময় জাবরিয়া ও কাদারিয়া নামে ২ টি ভিন্নধর্মী মতবাদের সৃষ্টি হয়। এই সময় ইসলামের প্রথম যুক্তিবাদী সম্প্রদায় মুতাজিলাদের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এই সময় আত্মপ্রকাশ করে। যেমন- শিয়া ও খারিজী সম্প্রদায়। মুরজিয়া নামক অপর একটি সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে। উমাইয়াগণ এদেরকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা :

উমাইয়া যুগে শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খলীফা আব্দুল মালিক ও আল-ওয়ালিদ শিক্ষার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারা শিক্ষানুরাগী হিসেবেও পরিচিত। তাদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্য জুড়ে বহু স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তখন মসজিদ ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দেওয়া হতো। রাজপরিবারে ও অভিজাত শ্রেণির পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখার রীতি প্রচলিত ছিল।

বিজ্ঞান চর্চা :

উমাইয়াযুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। খালিদ বিন ইয়াযিদ গ্রীক বিজ্ঞান চর্চা করে জ্ঞান অর্জন করেন। হারিস নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর রচিত গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ এ সময় আরবীতে অনূদিত হয়।

সঙ্গীত চর্চা :

উমাইয়া খলীফাদের রাজদরবারে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা হত। মদীনার তুবায়িস ছিলেন ইসলামী সঙ্গীতের গুরু। সাইদ ইবনে মিস্‌জাহ ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। নারীদের মধ্যে মদীনার জামিলা, সাল্লামা, হাবাবা, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

স্থাপত্য শিল্প :

শিল্পে উমাইয়া খলীফাগণ বিশেষ কীর্তি রেখে গেছেন। আব্দুল মালিক ও আল ওয়ালিদ ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদ। জেরুজালেমে আব্দুল মালিক বিখ্যাত কুব্বাতুস সাখ্‌রা ও আল- আকসা মসজিদ নির্মাণ করেন। আল-ওয়ালিদ দামেস্কের বিখ্যাত উমাইয়া জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মসজিদও বলা হয়। এছাড়াও মিসরের ফুসতাত মসজিদ ছিল উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

সারসংক্ষেপঃ

মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক ৬৬১ খ্রিঃ উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় যা ৭৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই খিলাফতের প্রকৃতি ছিল পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন হতে ভিন্নতর। এটি ছিল ইসলাম সম্প্রসারণের যুগ, রাজ্য বিজয়ের যুগ, তথাপি এটি মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও কুরআন হাদীস চর্চা এই যুগকে মহিমান্বিত করেছে। উমাইয়া যুগে যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বীজ উন্মোচিত হয়, তা পরবর্তীকালে অব্বাসীয় আমলে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সর্বপ্রথম রাজকীয় টাকশাল নির্মাণ করেন কে ?

ক) মুয়াবিয়া
খ) আল-ওয়ালিদ
গ) আব্দুল মালিক
ঘ) হিশাম

২. উমাইয়া আমলে আরবী ব্যাকরণ চর্চা শুরু হয় কেন ?

ক) সর্বত্র আরবী ভাষা শিক্ষা দানের জন্য

খ) অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে সহায়তার জন্য

গ) হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য

ঘ) কুরআন শিক্ষার প্রসারের জন্য

৩. উমাইয়া আমলে আবির্ভাব ঘটে -

i) শিয়া সম্প্রদায় ii) খারিজী সম্পদ্রায় iii) মুরযিয়া

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii খ) ii, iii

গ) i, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

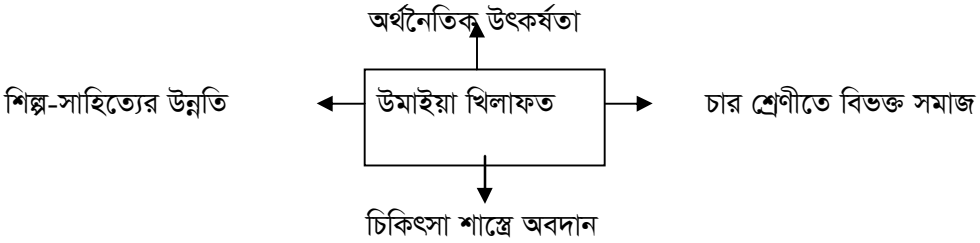

ক) মাওয়ালী কারা ? ১

খ) চিকিৎসাশাস্ত্রে উমাইয়াদের ব্যাপক অবদান রয়েছে- কথাটি ব্যাখা করুন । ২

গ) উমাইয়া যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিন। ৩

ঘ) ছকে উল্লেখিত সামাজিক শ্রেণির জীবনাচার বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৭.৯ উমাইয়া খিলাফতের পতন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমাইয়া খিলাফত কী কী কারণে পতন ঘটেছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- উমাইয়াদের পতনের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইবনে খালদুনেরতত্ত্ব, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মাওয়ালী, বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন**

৬৬১ খ্রি. হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর মাধ্যমে ইসলামিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করে রাজতন্ত্রের। তথাপিও তারা তৎকালীন ইসলামি রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করতে অনেকাংশেই সক্ষম হন। তারা রাজ্য বিজয়ে যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন তেমনি তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নানাবিদ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছিলেন। তবুও তাদের শাসনকাল কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না।

উমাইয়া বংশের পতনের কারণসমূহ :

ইবনে খালদুনের তত্ত্ব :

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালেদুনের মতে যে কোন রাজবংশের স্থিতিকাল একশত বছর। যে কোন রাজবংশই প্রতিষ্ঠা, উৎকর্ষ ও গৌরবের শিখরে আরোহণ, তার ক্রমাগত অবক্ষয় এবং অবশেষে পতন এই ৩ টি অধ্যায়কাল অতিক্রম করে। এই নীতি অনুসারেই মুয়াবিয়া কর্তৃক ৬৬২ খ্রি: প্রতিষ্ঠিত বংশ আব্দুল মালিক ও আল-ওয়ালিদ কর্তৃক চরম শিখরে অবস্থান করে এবং অবশেষে ৭৫০ খ্রি: তার পতন ঘটে।

সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব :

উমাইয়া খলীফাগণ পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতেন না। তাই পরবর্তী খিলাফতের দাবি নিয়ে পিতা-পুত্র ও পিতৃব্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হতো। এর ফলে এই বংশের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

খলীফাদের অযোগ্যতা ও বিলাসিতা :

কতিপয় খলীফা ব্যতীত যেমন- মুয়াবিয়া, আব্দুল মালিক, আল-ওয়ালিদ, ২য় উমর ব্যতীত প্রায় সকল খলীফাই ছিলেন রাজকার্যে অযোগ্য ও অদূরদর্শী। অপরদিকে অত্যাধিক বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন উমাইয়া বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

চারিত্রিক দুর্বলতা :

খলীফা মুয়াবিয়া (রা.) ও ২য় উমর ব্যতীত প্রায় সকল উমাইয়া খলীফাগণ চারিত্রিক দুর্বলতা প্রদর্শন করেন। মদ্যপান ও হেরেমের প্রতি অত্যাধিক অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদের ব্যক্তিগত জীবন কলুষিত হয় এবং জনগণ তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আরব-অনারব বৈষম্য :

উমাইয়া শাসনে অনারব মুসলিম বা মাওয়ালী মুসলিমদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ এর পতনে বহুলাংশে দায়ী ছিল। তাদের উপর অতিরিক্ত করারোপ তাদেরকে উমাইয়া শাসনের বিরোধিতায় উৎসাহ প্রদান করে।

হাশিমীয়দের সাথে দুর্ব্যবহার :

একমাত্র খলীফা দ্বিতীয় উমর ব্যতীত অন্যান্য উমাইয়া খলীফাগণ হযরত আলী (রা.) এর বংশধরদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। জুমুআর জামাআতের খুতবায় হযরত আলী (রা.) এর নামে অপ্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করা হতো। এতে করে অন্যান্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিরুপ মনোভাব পোষণ করে।

খলীফাগণের অধার্মিক কার্যকলাপ :

সাম্রাজ্য-বিস্তার ও সেই সাথে বিপুল ধন সম্পদ প্রাপ্তির ফলে পরবর্তী দুর্বল খলীফাগণ অন্ত:পুর নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ক্রীতদাসীর সাথে অনাচার ও ব্যভিচার তাদের জীবনী শক্তিকে হ্রাস করে দিয়েছিল। আরবীয় রক্তের দূষণ ঘটে। তৃতীয় ইয়াযিদ ও তার পরবর্তী দুজন উত্তরাধিকারী দাসীর পুত্র ছিলেন। শেষের দিকে অনেক খলীফা জুমুআর জামাতে অংশগ্রহণ করতেন না ও পবিত্র রমজানে রোযা পালন করতেন না। এরুপ অনৈতিক ও ধর্মহীন জীবনাচরণে মুসলিম সম্প্রদ্রায় তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে।

নিষ্ঠুরতা :

খলীফা ইয়াযিদের সময়ে সংঘটিত কারবালার হত্যাকাণ্ড, মক্কা ও মদীনায় তাদের ধ্বংসযজ্ঞ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোরতা ও সুলায়মান কর্তৃক প্রখ্যাত সেনাপতিদের সাথে নির্মম আচরণ উমাইয়া বংশের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্ব :

উমাইয়া খলীফাগণ নিজ নিজ স্বার্থ রাক্ষার জন্য কখনো হিমারীয়দের উপর আবার কখনো মুদারীয়দের উপর নির্ভর করতেন। তারা এক সম্প্রদায়কে অপর সম্পদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। এতে আরবগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে যা উমাইয়া খিলাফতের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

সেনাপতি ও মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা :

দুর্বল উমাইয়া খলীফাগণ নিজেদের বিলাসিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এতে অনেক মন্ত্রী ও সেনাপতি নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজ দায়িত্ব অবহেলা করতেন ও নিজ স্বার্থনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এতে করে উমাইয়া শাসনের অভ্যন্তরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে এর পতনকে ত্বরান্বিত করে।

খারিজী বিদ্রোহ :

উমাইয়াদের ঘোরতর শত্রু ছিল ও তাদেরকে অবৈধ দখলদার হিসেবে চিহ্নিত করে। খারিজীদের ক্রমাগত বিদ্রোহ উমাইয়া শাসনের ভিতকে দুর্বল করে দেয়।

শিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান :

কারবালার করুণ ঘটনা শিয়া সম্পদায়ের জন্ম দিয়েছিল। হাশিমীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, খলীফাদের বিলাসী জীবন এবং চরিত্রহীনতা ও কুরআন হাদীস হতে বিচ্যুতি শিয়া সম্প্রদায়কে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর হতে বাধ্য করেছিল।

আব্বাসীয় আন্দোলন :

বিলাসী জীবন, আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয়ে উমাইয়াদের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। এর সাথে বার্বার, খারিজী বিদ্রোহ, আরব-অনারব দ্বন্দ্ব ও মাওয়ালীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ আব্বাসীয় আন্দোলনকে বেগবান করে। শিয়া, খারিজী ও মাওয়ালীরা আব্বাসীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিসা পালন করে। অবশেষে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা ৭৫০ খ্রি: ২য় যাবের যুদ্ধে সর্বশেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করে। এর মাধ্যমে উমাইয়া বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

সারসংক্ষেপ:

ধাপে ধাপে উমাইয়া বংশের পতনের ভিত রচিত হয়। কোন সুনির্দিষ্ট কারণে এই বংশের পতন ঘটেনি, অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ এর পতনের পিছনে দায়ী ছিল। উমাইয়াগণ যে তরবারির জোরে একদিন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, দীর্ঘ ৯০ বছর শাসনের পর তা অন্য নতুন তরবারির জোরেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উমাইয়া বংশের পতন কত সালে হয় ?

ক) ৬৬১ সালে খ) ৭৫০ সালে

গ) ৭১২ সালে ঘ) ৭১৫ সালে

২. উমাইয়া খিলাফতের পরিসমপ্তি ঘটে কী কারণে ?

ক) খারিজী বিদ্রোহের জন্য
খ) আব্বাসীয় আন্দোলনের জন্য
গ) মাওয়ালী বিদ্রোহের জন্য
ঘ) শিয়া বিদ্রোহের জন্য

৩. উমাইয়া খিলাফতের পতনের অন্যতম কারণ কী ?

i) ইসলামকে পার্থিবকরণ
ii) অধর্মীয় কার্যকলাপ
iii) স্বৈরাচারী নীতি

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i
খ) ii
গ) i, ii
ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

'ক' নামক রাজবংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাজতন্ত্র। অধিকন্তু এ যুগে উত্তরাধিকার নির্বাচনেরও কোন সুনির্দিষ্ট আইন কানুন না থাকায় সাম্রাজ্যে বহু গোলযোগ দেখা দেয়। এ যুগের শেষ দিকের সম্রাটগণ সুন্দরী দাসী ও রমণী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে তাঁরা জুমুআর জামাআতেও যোগদান করত না। এসব কারণ ছাড়াও আরো বিভিন্ন কারণে তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত 'ক' রাজবংশ ৯০ বছর পর আরেক নতুন তরবারির জোরেই তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

ক) কোন যুদ্ধের মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন হয় ? ১
খ) উমাইয়া বংশের পতনে ইবন খালদুনের তত্ত্বটি লিখুন ? ২
গ) উদ্দীপকের 'ক' বংশের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে আব্বাসীয় আন্দোলন ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) উদ্দীপকের 'ক' বংশের পতনের উল্লেখযোগ্য নিয়ামক গুলো কি ছিল। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১. (খ) ২. (ঘ) ৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১. (ক) ২. (খ) ৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১. (খ) ২. (ঘ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৯ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (ঘ)